প্রথম খণ্ড।

মুখবন্ধ।

এ খণ্ডে আমরা সময়াভাব বশতঃ অন্যান্য ফটো ও চিত্র এবং অবশিষ্ট আত্মকথা দিতে পারিলাম না। তাহা দ্বিতীয় খণ্ডে দিবার ইচ্ছা রহিল। "দ্বীপান্তরের কথা"র ইংরাজি ও হিন্দী অনুবাদ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। "দ্বীপান্তরের কথা"র কতক অংশমাত্র "নারায়ণে" প্রকাশিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট আত্মকথা নারায়ণে ক্রমশঃ প্রবন্ধাকারে বাহির হইবে।

ইতি—

প্রকাশক।

উৎসর্গ

কক্ষভ্রষ্ট গ্রহের মত যখন অন্ধকারে

দেশের নাড়ীর সম্বন্ধ হারিয়ে

একা পড়েছিলাম

তখন

যার স্নেহ-ধারাটুকু আমায়

দেশ-মায়ের স্পর্শ দিয়ে

জুড়িয়ে রেখেছিল

সেই

দিদিকে

দিলাম।

ভূমিকা।

"শিকল-দেবীর ঐ যে পূজা বেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া ?
পাগলামি, তুই আয়রে দুয়ার ভেদি' !
ঝড়ের মাতন ! বিজয়-কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে,
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন্‌রে বাছা বাছা।
আয় প্রমত্ত, আয়রে আমার কাঁচা।"

বিশ্বের ভাগ্য-বিধাতার আহ্বানে বাংলা দেশের শিকল-দেবীর পূজাবেদী ভাঙিবার জন্য যে ঝড়ের মাতন একদিন আসিয়াছিল, অট্টহাস্যে ভারতের আকাশখানা প্রতিধ্বনিত করিয়া ভোলানাথের যে সকল পাগল অনুচর বিজয়কেতন লইয়া বাহির হইয়াছিল—দ্বীপান্তরের কথা তাহাদেরই অপূর্ব্ব জীবনের একটা বিচিত্র অধ্যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ভারতের পূর্ব্ব গগনে দারুণ গ্রীষ্মের পর বর্ষার মেঘ নিবিড়ভাবে জমিয়া আসিয়াছিল—বাংলার তৃষিত প্রান্তর শীতল করিয়া বনভূমি শ্যামল করিয়া প্রাণের শ্রাবণ বরষিয়া গেল—নিশীথ রাতের সে বাদল ধারার কথা আজ আর একবার মনে করিতে হইবে। সুখের শরৎ আজ আসিয়াছে—সেই কালো মেঘগুলি আজ শাদা হইয়া সীমাহারা নীল-বিথারে সাগরের শুভ্র ফেনার মত ভাসিয়া বেড়াইতেছে—সে নয়নমোহন রূপ দেখিয়া আজ জীবন সার্থক করিয়া লও—আজিকার এই শারদ জোছনায় শারদীয়া পূজার প্রারম্ভে শক্তি-উদ্বোধয়িতার জীবন কথার একটা অধ্যায় শুনিয়া লও।

বর্ষার ঘোর দুর্দ্দিনে কংসের কারাগারে ভগবান জন্ম লইয়াছিলেন। যুগে যুগে দেশে দেশে তিনি এমন দুর্দ্দিনে এমনি ভাবেই আসিয়া থাকেন। তাই দুঃখের বোঝা বহিয়া, শত অত্যাচার সহিয়া সেই আশাতেই মানুষ বাঁচিয়া আছে। ধরিত্রীর বক্ষ হইতে পাপভার হরণ করিবার জন্য, আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে ঈশা মাত্র একবারই আসেন নাই; তিনি নানারূপে নানাভাবে মানুষের মাঝে আসিয়া থাকেন। দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর সঞ্চিত আঁধারে আজ ভগবানের উজল মূর্ত্তি দেখা দিয়াছে। আমাদের প্রথম প্রায়শ্চিত্ত-যজ্ঞ শেষ হইয়াছে—অমৃতের আলোকে হে সন্ধানী, এইবার পথ দেখিয়া অগ্রসর হও। এই বিরাট যজ্ঞে যাহারা আহুতি হইল —তাহাদের মর্ম্মকাহিনী একবার শুনিয়া লও। মরণের মাঝে যাহারা অট্টহাস্য করে—তাহাদের হাস্যে একবার যোগ দাও।

সংসারে এমন কতকগুলি মানুষ আসে যাহাদিগকে শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। তাহারা নিজের খেয়ালে হাসিয়া খেলিয়া চলিয়া যায়; পতঙ্গের মত আগুনের বুকে ঝাঁপ দেয়; নিজের খুসীতে কত ভাঙে, কত গড়ে; সংসারের মুদিভায়া তাহাদের জীবন খাতার হিসাবটা ঠিক মিলাইতে না পারিয়া ভীষণ মুস্কিলে পড়িয়া যান। এই সকল লোক যেন এক একটা dynamo—ইহাদের প্রাণের স্পর্শে আসিয়া কত আলো জ্বলিয়া উঠে। ভারত তমোগুণের অসাড়তায় নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়াছিল—বাংলার প্রাণ এই অসাড়তা ভাঙিবার জন্য প্রথম চেতন হইয়া উঠে। যে দেশে লক্ষ লক্ষ নর নারী রোগে, দুর্ভিক্ষে মরিতেছে—সেখানে মরণের নাম শুনিলে মানুষ চমকিয়া উঠিত। প্রাণপণে জীবনটাকে যত আঁকড়িয়া ধরিবে—ততই তাহার শক্তি যে দূরে অন্তর্ধান করিবে, একথা বুঝিবার লোক তখন বড় একটা ছিল না।

বাঁচিবার একটা প্রধান সর্ত্তই যে মরা। "সহস্র ধারায় ছুটে দুরন্ত জীবন-নির্ঝরিণী, মরণের বাজায়ে কিঙ্কিণী।" যে জাতি এ মরণ ভুলিয়া

গিয়াছে—তাঁহার বাঁচা শেষ হইয়া আসিয়াছে। "মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি বহিছে যেই প্রাণ, সেই তো তোমার প্রাণ"—এ মৃতজাতিকে সেই কথা শিখাইতে জনকতক মানুষের দরকার ছিল। বাংলা দেশে সে মানুষ আসিয়াছে। মরণের পালা শেষ করিয়া নবীন বাংলা আজ অমৃতে পুনর্জন্ম লভিয়াছে—ভারত সেই অমৃত মন্ত্রের অধিকারী হইবার জন্য জাগিয়া উঠিয়াছে। বিশ্বের দেবতার ডাক আজ তাহার কানে পৌঁছিয়াছে। এই মন্ত্রের সাধনায় বাংলা ভারতের, ভারত বিশ্বের হইয়া যাইবে—বিশ্বমানবের মঙ্গল-যজ্ঞে বাঙ্গালীর সুর নূতন মন্ত্র ধ্বনিত করিবে।

দ্বীপান্তরের কথা তাই একজনের দুইজনের কথা নয়। ইহা নবজীবনের ডায়েরীর এক পাতা। ইহার সার্ব্বভৌমিক সার্থকতা আছে। এ জীবন কারাগারেও শৃঙ্খল-মুক্ত, মরণের মাঝেও জীবনের হাসিতে ভরপুর। এত বড় জীবন বলিয়াই তাহা দারুণ কারা-যন্ত্রণায় নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। জল্লাদের ভ্রূকুটি সে প্রাণকে আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে নাই। ফিরিবার কথা ছিল না—তবুও প্রাণের স্রোত অন্য দিকে ফিরে নাই। কেবল তাহার জ্বালাময়ী গৈরিকস্রাব আজ শীতল-সলিলা স্রোতস্বিনীর আকার ধারণ করিয়া, শ্রাবণের ধারাসিঞ্চিত ভূমিতে শীতের পর বসন্তের নবীন শ্যামলতা আনিয়া দিয়াছে।

সে প্রাণের পূর্ণতায় আজ জগৎ ভরিয়া উঠুক। পুরাতনের ভিতর যাহা কিছু সাচ্চা তাহাই নূতন উজ্জ্বলতায় ভাসিয়া উঠুক—মৃত্যুর চিহ্ন সংসার হইতে মুছিয়া যাক। ধর্ম্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, সভ্যতা প্রাণের মহাপ্লাবনে নূতন পলিমাটিতে নূতন ফসল প্রদান করুক। সে মহাপ্লাবনের গঙ্গাবতরণ যে শিবের মাথার উপর হইয়াছে—স্বর্গের মন্দাকিনী ধরায় আসিয়া আমাদের হইয়াছে—সেই ভোলানাথকে আদর্শ করিয়া—এস নব-জীবনের নূতন ভাগীরথীর পুণ্যবারিতে আমাদের মহাভিষেক সম্পন্ন করি—

সে আভষেকের নূতন মন্ত্র নূতন গীতা লিখিত হইয়াছে। মর্ম্মচেরা রক্তরেখায় লিখিত সেই গীতা এস উষার অরুণ আলোকে পড়িয়া লই। আমাদের আরাধ্য দেশ-মাতৃকা আজ বিরাট বিশ্বরূপে ফুটিয়া উঠুক।

কলিকাতা,
১৫ই ভাদ্র, ১৩২৭।

শ্রীহেমন্তকুমার সরকার।

বাম হইতে দক্ষিণে পর পর—

১। শ্রীবিভূতিভূষণ সরকার। ২। শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

৩। শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়।

দ্বীপান্তরের কথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অকূলে যাত্রা।

সে দিনটা বোধ হয় ১৯০৯ সালের ১১ই ডিসেম্বর। বার বৎসরের কারাজীবনের ওলটপালটে আর বেশী কিছু হয় নাই, কেবল স্মৃতি শক্তিটা প্রায় মৃতকল্প দশায় পড়িয়া চিঁ চিঁ করিতেছে। অতীত ঘটনা গুলা সব হইয়া গিয়াছে যেন এক ছিলিম গাঁজার নেশার অলৌকিক ধূমমার্গী দর্শন; কোন্ ঘটনাটা যে কবে কাহার পর ঘটিয়াছিল, তাহা বলে কাহার সাধ্য, আমার তো নয়ই। সুতরাং দ্বীপান্তরের কথা লিখিতে গিয়া মজা হইবে মন্দ নয়, আগাগোড়া সব উদোর পিণ্ড বুদোর ঘাড়ে দিয়া না বসিয়া থাকি। তবে পারের কাণ্ডারী আছে উপেন, সে যবনিকার অন্তরাল হইতে বেশ জোর গলায় ফিস্ ফিস্ করিয়া "পার্ব্বতীসুত লম্বোদর" বলিয়া যাইবে, আর আমি আশা আছে "পাক দিয়া সূতো লম্বা কর" বলিব না, ঠিক উপেনেরই কথার যথাসাধ্য অনুবৃত্তি করিয়া যাইব। সুতরাং হে সুধীজন! এ দ্বীপান্তরের কথা আমাদের দুই জনের দুই মুখের এক কথা, ইহাতে সত্য বলিয়াছি প্রিয় বলিয়াছি, শাস্ত্রবচন লঙ্ঘন করিয়া অপ্রিয় বা অসত্য বলি নাই।

আলিপুর জেলে আমরা থাকিতাম 'চোয়াল্লিশ' ডিগ্রিতে। এখন সে আলিপুর জেল প্রেসিডেন্সি জেলে পরিণত হইয়াছে; সে দিন দ্বীপান্তর হইতে ফিরিয়া তাহার সে নবকলেবরধারী সমৃদ্ধ রূপ দেখিয়া আমাদের সে

পুরাতন শরশয্যাটীকে আর চিনিতে পারি নাই। থাকিতাম চোয়াল্লিশ ডিগ্রিতে,—এই কথার ভাষ্যের দরকার; চোয়াল্লিশ ডিগ্রিটা যে কোন থার্মোমেটার ঘটিত সব্ নরমাল্ ব্যাপার নয় তাহা না বুঝাইলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন না। চোয়াল্লিশ ডিগ্রি মানে সারি সারি এক লাইনে ৪৪ খানি কুঠুরি, সেগুলি গায়ে গায়ে হইলেও প্রত্যেক কুঠুরিটির আলাদা পাঁচিল ঘেরা তিন চার হাত করিয়া উঠান আছে। উঠানে একটি মাত্র কাঠের দরজা, তাহার গায়ে এক ইঞ্চি গোল কাঁচ লাগান এক একটি ছিদ্র, এই ছিদ্রে চক্ষু লাগাইয়া বাহিরের প্রহরী ভিতরের খাঁচার দ্বিপদ জানোয়ারটী কি করিতেছে, তাহা দেখিতে পারে। সকলগুলি কুঠুরির সামনে দিয়া লম্বা উঠান চলিয়া গিয়াছে; এ উঠানটিও পাঁচিল ঘেরা। এখানে একটি sentry-box বা প্রহরীর বিশ্রামের জন্য কাঠের রথের মত ঘর আছে। এই উঠানে কাঁধে বন্দুক লইয়া ধরাকে সরাজ্ঞান করিয়া রক্তমুখ গোরা সান্ত্রীটি ঘোরে। এই উর্দ্দিপরা হেলমেট্‌ধারী নীল-চক্ষু পেয়াদাগুলি দূর হইতে দেখিতেই আতঙ্কের জিনিষ কিন্তু পরে তাহাদের সহিত ভাব করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়াছি, নিতান্ত সরল পোষা মেনী বিড়ালটির মতই নিরীহ।

এই চোয়াল্লিশ ডিগ্রির প্রথম তিন চারিখানি কুঠুরির নাম condemned cell বা ফাঁসির আসামীর ঘর। আমি আর উল্লাস দা' তখন গলায় দড়ি দিয়া ভবপারে যাইবার যাত্রী, মাথার উপর মিহী সুতায় বাঁধা খড়্গের মত ফাঁসির হুকুম ঝুলিতেছে। হাইকোর্টে আপিল চলিতেছে, যদি জজ সাহেব সুবিচার করেন তবে আন্দামানে জীয়ন্তে কবরস্থ হইতে যাইব, আর অবিচার করেন তো দুর্গা বলিয়া ঝুলিয়া পড়িব। আর আর সকলে পাটের ফেঁসো ছাড়াইত, স্নানাহারের সময়ে বাহিরে উঠানে ঘুরিত ফিরিত, এবং চেড়িদিগের চক্ষু এড়াইয়া পরস্পরের সহিত নেপথ্যে দুই একটা চোরা চাহনী বা রসের কথা বলিয়া লইত, নিদেন পক্ষে মনের সুখে মুখ ভেঙ্গাইয়া লইত। আমরা

দুই জনে মরণপথের যাত্রী বলিয়া এ সুখ হইতে বঞ্চিত ছিলাম, দিবারাত্র বেকার বন্ধ থাকিতাম; আমাদের স্নানাহার ছিল ঐ বন্ধ ঘেরা চার হাত প্রস্থ উঠান টুকুতে। মানুষের মুখ দেখিতে যা' ঐ ষণ্ডামার্ক জেলার হিল্ সাহেব, একজন "মাঝে মাঝে তব দেখা-পাই" গোছের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ছ্যাকরা গাড়ীর বেতো ঘোড়ার মত জীর্ণ windblown হেড ওয়ার্ডার উইল্‌শ সাহেব, আর তিন ঘণ্টা অন্তর এক এক জন জেল পুলিশ। প্রকৃতির দৃশ্যের মধ্যে মাথার উপর একটু খানি নীল মনহরণ আকাশ, চৌদ্দ হাত উচু দেওয়ালের ওপারে কয়েকটা আম কাঁঠাল পিপুল অশ্বত্থের রৌদ্রমাখা চক্ষুজুড়ান হরিত মাথা এবং মুক্ত পাখীর আসা যাওয়া ও অবাধ কাকলী। সবুজ দূর্ব্বা বা ফোটা ফুল এ সব সাত মাস দেখি নাই, নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে পরিচিতের সাহচর্য্য বা দর্শনও একটিবার ছাড়া ঘটে নাই; তবে সাধন ভজনে আকণ্ঠ ডুবিয়া ছিলাম বলিয়া স্নেহ মমতার ও চক্ষু কর্ণের সে দুর্ভিক্ষও সহিয়াছিল; তেলা গায়ে জলের মত সব দুঃখ দৈন্য গড়াইয়া পড়িয়াছিল; কাঁটা হইয়া বুকের মধ্যে ফুটিয়া থাকে নাই।

হিল্ সাহেব অত দুর্দ্দান্ত হইয়াও আমায় বড় ভাল বাসিতেন, দুই হাতে তুলিয়া খোকার মত নাচাইতেন, বলিতেন, "এই মানুষ এত বড় রাক্ষুসে কাজ করিয়াছে, তাহা তো বিশ্বাস হয় না।" কিছু দিনের জন্য এক জন নূতন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিয়াছিলেন, তিনি পরমার্থ সম্বন্ধে আমার সেজদা'কে (অরবিন্দ) লেখা চিঠি পড়িয়া ধরিয়া বসিলেন যে, তাঁহাকে সাধন দিতে হইবে। আমি তো মহা ফাঁপরে পড়িলাম; কত করিয়াই বুঝাই যে, "সাহেব আমি নিজেই এ সব বিষয়ে আনাড়ি পথিক, দিবার আমার কিছুই নাই; কিন্তু 'ভবী ভুলিবার নয়'! দু'চার দিন পিছু লাগিয়া না পারিয়া শেষে সাহেব মর্ম্মান্তিক চটিয়া গেলেন। হেড ওয়াডার্ উইল্‌শ আমাকে স্বর্গীয় পরম পিতার প্রেম ও পাপীর অনুতাপের কথা বুঝাইবেই বুঝাইবে;

তাহার অদম্য অধ্যবসায় দেখিয়া আমিও ভক্ত গরুড়টির মত শুনিতাম ; সে যে কি রকম কালাপাহাড়কে খৃষ্টপ্রেম শুনাইতে ধরিয়াছে তাহা আর ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মর্ম্মব্যথা দিতাম না। তাহার বাপ ছিল ইঞ্জিনিয়ার, কতকগুলা মরিচাধরা পুরাণ পেরেক জলে সিদ্ধ করিয়া লোহাকষ (iron tonic) তৈয়ার করিয়া ছেলেদের নাকি খাওয়াইত। ছেলের বুদ্ধিতে কেন যে এমন মরিচা ধরিয়াছে, ইহার পর আর তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না। লোকটি কোয়েকার (quaker), অতি সরল, তবে আইনের মর্য্যাদায় অতি বড় গোঁড়া।

ডিসেম্বর মাসের গোড়ায় বোধ হয় আমার ও উল্লাসদা'র ফাঁসির হুকুম ঘুরিয়া যাবজ্জীবেৎ তাবৎ কালাপাণিসই হইবার হুকুম হইল। সেবার মরিতে গিয়াও মরিতে ইচ্ছা হয় নাই, কায় মনে ডাকিয়া ছিলাম, যে, "এবারকার মত জীবনটা ফিরাইয়া দাও, এখনও যে 'সর্ব্ববন্ধনমুক্তির বুকজুড়ান সুখে আরাম করিয়া মরিতে পারিব না।" যেমন ভাব তেমনি লাভ, তাই ঠাকুর বুঝি শুনিলেন। মরণটা সেবার আমার রগ ঘেঁসিয়া গেল ; পাশের কুঠুরি হইতে আজ চারুকে বাঘে লইল, কাল বৃটিশ সিংহ কানাইয়ের ঘাড় ভাঙ্গিল, দু'দশ দিন পর সত্যেন মামাও ইংরাজ-কেশরীর উদরস্থ হইল। বাঘ কিন্তু আমার কাছে আসিয়া পোষা মেনী বিড়ালটির মত গা শুঁকিল, চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘাড় মটকাইবার আয়োজন করিয়া সহসা গজেন্দ্রগমনে চলিয়া গেল। তিন তিনটা আস্ত পেট্রিয়ট ভারত উদ্ধারীকে খাইয়া বোধ হয় বাঘের পেট তখন ভরা ছিল।

হাইকোর্টের রায় বাহির হইবার পর এক পক্ষ কাল অবধি আলিপুর জেলে ছিলাম। তাহার পর অকূলে পাড়ি দিবার—আন্দামান যাইবার পালা। ১১ই ডিসেম্বর বিকালে সাধারণ কয়েদীর চালান বেড়ি পরিয়া ঝমর ঝম্ শব্দে মল বাজাইয়া S. S. Maharajaয় চড়িবার উদ্দেশ্যে তক্তাঘাটে যাত্রা করিল।

আমাদিগকে বিকালে বাহির করিবার সব আয়োজন করিয়াও আবার কি ভাবিয়া আহারাদি করাইয়া নিত্যনৈমিত্তিক ভাবে ঘরে পুরিল। রাত তিনটা কি চারটার সময়ে "উঠ উঠ জাগো জাগো" রব। সেই হাড়ভাঙ্গা শীতে হি হি করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হাঁটুর উপরি অবধি ধুতি হাতকাটা পিরাণ ও মাথায় পগ্‌গড় পরিয়া গেটে গিয়া সারি বাঁধিয়া বসিলাম। সে এক চড়ক পূজার সঙ আর কি! গলায় গরুর ঘণ্টার মত লোহার হাঁসলিতে (ring) বাঁধা তক্তি, পায়ে বেড়ি আর ঐ পোষাক!! আমরা ত এ উহার চেহারা দেখিয়া মনে মনে হাসিয়াই খুন; অবশ্য এখনও জেলের অধিকারের মধ্যে, তাই চাপা হাসির পেট ফুলানটা গড়াগড়ি দিয়া কমাইবার কোন উপায়ই আমাদের ছিল না।

সংসারে সুখ দুঃখ সব অবস্থার কথা; এক অবস্থায় যাহা বুকভাঙ্গা দুঃখ, অন্য অবস্থায় তাহাই স্পৃহনীয় সুখ। দিব্য কার্ত্তিকটির মত সাজাগোজা একজন ঠাকুর-বাড়ীর ছেলেকে তাহার মটর গাড়ী হইতে টানিয়া নামাইয়া জবরদস্তি এই রকম সঙ সাজাইয়া দাও, সে হয়তো অপমানে ক্ষোভে সোজা দৌড়িয়া গিয়া "মা গঙ্গে! নিও" বলিয়া জলে ঝাপ দিবে। আমাদের কিন্তু বড় সুখ হইল। একই ভাবে বদ্ধ থাকিয়া পাটের ফেঁসো ছাড়াইয়া পেয়াদার গুতায় কাষ্ঠমৌন অভ্যাস করিয়া করিয়া অন্তর পুরুষ হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, এ রকম নূতন সঙ দেওয়াও একটা নূতন কিছু বলিয়া বড় আনন্দদায়ক হইয়াছিল; এই অকূলে ভেলা ভাসাইয়া উল্টারাজার দেশে যাত্রাটা মনে হইতেছিল যেন একটা মজার picnic বা চড়ুইভাতী।

বাহির হইয়া দেখি, এ যেন মহাকালী পাঠশালার গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে! গাড়ীখানি তেমনি লম্বা, তেমনি চারিদিকে ঘুলঘুলি আঁটা বাক্সবন্দী, তেমনি চলিতে গমগমে আওয়াজ দেয়। এই গাড়ীতে আমরা কোর্টে যাইতাম। আমরা তখন সরকারী বেগম, কুলবধূর অধিক পর্দ্দানসিন ও অসূর্য্যম্পশ্যা।

তাহাতেই গুড়িগুড়ি উঠিয়া তালাচাবি বদ্ধ হইয়া মনের সুখে জাহাজঘাটে যাত্রা করিলাম। চারিদিকে পুলিশ ঘোড়সওয়ার; পাদানিতে, উপরে, পাশে গোরা সান্ত্রী; গাড়ীখানি পথ কাঁপাইয়া চলিল। সোডাওয়াটারের বোতলের ছিপি হঠাৎ খুলিলে যেমন করে, গাড়ী চলিতেই সাত মাসের আঁটা পেটের ছিপিটা খুলিয়া আমাদের তেমনি দশা হইল। পড়ি কি মরি করিয়া এত দিনের গুদামজাত কথাগুলা ফোয়ারার মত বাহির হইতে লাগিল।

জাহাজ-ঘাটে পঁহুছিয়া বাহির হইয়া দেখিলাম, তখনও রাত আছে; সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইমার্স‌ন্ সাহেব ঘাটে বাইক্ লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দিকে দিকে পুলিশ সওয়ার। কালাপাণি বৈতরণীর না'ও সেই মহারাজায় উঠিলাম। নীচে একটা হোল্ডে লইয়া গিয়া আমাদিগকে পূরিল। সেই ঘরের মেঝের তক্তার গায়ে একটা শিকল লম্বাভাবে আটকান আছে, তাহাতে দেড় দুই হাত অন্তর এক একটা হাতকড়ি লাগান। আমাদিগের সাতজনকে বসাইয়া সেই হাতকড়িতে এক এক হাত আট্‌কাইয়া দিল, তাহার পর দরজায় সান্ত্রী খাড়া করিয়া চাবি দিয়া সকলে চলিয়া গেল। এখন এই প্রথম বম্‌কেশের আন্দামান-যাত্রী সাতজনের নাম বলি, কুল শীল তো জগদ্‌বিদিত। চেনা বামুনের পৈতার দরকার কি?—

১। শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ।

২। শ্রীউল্লাসকর দত্ত।

৩। শ্রীহেমচন্দ্র দাস।

৪। শ্রীহৃষীকেশ কাঞ্জিলাল।

৫। শ্রীইন্দুভূষণ রায়।

৬। শ্রীবিভূতিভূষণ সরকার।

৭। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

যাঁহাতক দরজা বন্ধ করিয়া সরিয়া যাওয়া, তাঁহাতক নরক গুলজার আর কি! মেঝেয় সেই হাতকড়ি লাগান দশায় উপু হইয়া একপাশে কাৎ ভাবে কেহ গান ধরিল, কেহ গল্পের কল্লরোল তুলিল এবং কেহ কেহবা রঙ্গরসিকতায় ও অট্টহাস্যে জাহাজ কাঁপাইয়া তুলিল। সে কি কলরব! কি হল্লা!! কিন্তু তাহার ফল হইল ভাল; জাহাজের কাপ্তান, প্রহরী ও পুলিশ আফিসারদের ধড়ে এতক্ষণে প্রাণ ফিরিয়া আসিল। আমাদিগের আনন্দ কলরব শুনিয়া তাহারা বুঝিতে পারিল যে, কাক মারিতে কামান দাগা হইয়াছে। বোমার আসামী পোর্ট ব্লেয়ারে লইয়া যাইতে হইবে শুনিয়া বোধ হয় তাহাদের দুর্ভাবনায় কয়েক রাত্রি নিদ্রা হয় নাই; বোধ হয় ভাবিয়াছিল, এ রকম অসমসাহসিক জীবগুলি আসিলেই হয়তো মদমত্ত হস্তিযূথের মত জাহাজ "তছনছ" করিয়া দিবে। জাহাজ ছাড়িবামাত্র আমুদের দল দেখিয়া তাহারা আসিয়া আমাদের হাতের হাতকড়ি খুলিয়া দিল। উপেন ও সুধীর সরকার অসুস্থ থাকায় আমাদিগের পরের জাহাজে পোর্ট ব্লেয়ারে যায়; সেই সময়ে জাহাজের কর্ম্মচারীরা আমাদিগের সম্বন্ধে উপেনকে বলিয়াছিল, "প্রথমে আমরা তাদের বেঁধে রাখি, তারপর দেখলুম সব খুব আমুদে লোক (a merry party); তখন খুলে দিই।"

হাতকড়ি খুলিয়া দিবামাত্র কম্বল পাতিয়া ঢালা বিছানা করিয়া আসর জমকাইয়া সব বসা গেল। সে দলে হেম দা' আর উল্লাস দা' মস্ত গাইয়ে, তাহার উপর উল্লাস দা' নানারকম সঙ দিতে রঙ্গরসিকতা করিতে অদ্বিতীয়; হেম দা'ও বড় একটা কম যান না। এ বলে আমায় দ্যাখ্ ও বলে আমায় দ্যাখ্; যেখানে এই দুই জন থাকে, তাহার ত্রিসীমায় শোক দুঃখ থাকিতে পারে না। গানের পর গান চলিতে লাগিল, এতদিনের আটকানো কথাগুলা তুব্ড়ি বাজীর মত অবিশ্রান্ত অনর্গল বাহির হইতে লাগিল। দাঁত থাকিতে কেহ দাঁতের মর্ম্ম বুঝে না,—তাই মানুষের সঙ্গে কথা বলিয়া যে এত স্বস্তি,—

এত আরাম, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। আরও কত কিই যে জানিতাম না, এই টানাপোড়েনের দীর্ঘ কয়টি বৎসরে কত কিই যে শিখিলাম! আমাদিগের অধিকাংশের সংসার-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা ছিল শ্রীরামচন্দ্রের সহায় সেই শাখামৃগদের হইতে খুব যে বেশী তাহা নহে। অবশ্য হেমদা' বাদে, কারণ সে সংসারে স্ত্রী পুত্র লইয়া সরকারী চাকরী সংস্রবে পুলিশ ঘাঁটিয়া জীবনে অনেক "পোড় খাইয়া" মানুষ হইয়াছিল।

এইরূপে গল্প গুজব গান ও রঙ তামাসায় অকূলের অনির্দ্দিষ্ট জীবনপথে যাত্রা করা গেল। কি যে কালাপাণি, সেখানে কি খাইতে—কি করিতে হইবে, তাহার নাম গন্ধ অবধি জানা নাই। সেই ঘরেই নর্দ্দমার পাশে একটা বাল্‌তী ছিল, তাহাই শৌচাগার; প্রকৃতির তাড়নায় সেখানে কেহ বসিলে আর সকলকে মুখ ফিরাইয়া থাকিতে হয়। লজ্জা মান ভয় তিন থাকিতে নয়, তাহার সাধনা এইখান হইতেই আরম্ভ। জাহাজের গায়ে মোটা কাঁচ আঁটা একটা ঘুলঘুলি ছিল, তিড়িং করিয়া লাফাইয়া উঠিলে, মা ধরিত্রীর নাড়ীর টানে নীচে পড়িবার আগে নিমেষের জন্য নীল সাগরের বীচিবিক্ষুব্ধ পাগলা প্রাণটা দেখা যায় একে তো যাহা সুন্দর, তাহা কত টানে; তাহার উপর সে সুন্দর যদি ক্ষণিক হয়, তাহা হইলে সে কি যাদুই যে জানে, তাহা বলিয়া শেষ করিবার নহে। কোজাগরী মাধুরীময়ী নিশা একটি রাত্রির জন্য আসে, তাই, সে চাঁদে মানুষের অন্তরে অন্তরে চাঁদে চাঁদময় করিয়া দিয়া যায়। নিত্যকার হইলে বুঝি কেহ ফিরিয়াও দেখিত না। কুচ্‌কুচে কালো অমাবস্যার জন্য হা হতোস্মি করিয়া কবিতা লিখিতে বসিয়া যাইত। সেই টল্‌টলে সীমাহারা নীলের একটি মুহূর্ত্তের দর্শনে—অবগুণ্ঠিতার আধঢাকা সুষমায় আমাদের মন টানিয়াছিল, তাই থাকিয়া থাকিয়া বিভূতি ইন্দু আমি উল্লাসদা' বেড়ি লইয়াও এক একটা লাফ দিয়া সেই দেখিবার-নয় ধন দেখিয়া লইতেছিলাম।

বেলা দুইটার সময়ে দরজা খুলিয়া জগন্নাথ-যাত্রীর মত পোঁটলা পুঁটলি হাতে ধামা-বগলে জনকয়েক লোক ঘরে ঢুকিল। ব্যাপার কি রে, বাপু! শুনিলাম, ইহারা সব ভাণ্ডারী অর্থাৎ ভাঁড়ারী; ছোলা-ভাজা, চিড়া, নুন, লঙ্কা আর চিনি বিতরণ করিতে আসিয়াছে। শেষে কিনা চিড়া খাইতে হইল! দফা ঠাণ্ডা আর কি!! চক্ষু স্থির!!! জিজ্ঞাসা করা গেল, "ক'টা বেজেছে গো?" তাহারা উত্তর দিল, "বেলা দু'টা।" আমরা তো অবাক্! দু'টা! সকাল নয়টা নয়? গল্পের নেশায় চুর মাতাল আমাদের কালজ্ঞান আদৌ ছিল না; ঘণ্টাগুলা রোগা সিড়িঙ্গে হইয়া কোথা দিয়া যে চক্ষের অলক্ষ্যে সুড়সুড় করিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল, তাহা কেহই টের পাই নাই। তাহার পর ক্রমাগত সেই "চিঁড়া নাও" "ছোলা নাও" রব! ভালরে ভাল! আমরা কি ঘোড়া না চোগোঁপ্পা ভোজপুরী দারোয়ান, যে ছোলা চিঁড়া চিবাইব? "চিঁড়ে টিড়ে অচল, বাপু; দু'টি ভাত দিতে পার?" তাহারা বলিল, "ভাত মুসলমানে রাঁধে, মুসলমানে খায়; ঠুন্‌কো জাতের ভয়ে তটস্থ হিন্দু ছোলা খাইয়া ধর্ম্ম রাখে।" হা মাতঃ অন্নপূর্ণে! এ ঘোর দুর্দ্দিনে তোমার মোল্লা মূর্ত্তি, মা? আমাদের মধ্যে একজন উদ্ধত ইয়ং-বেঙ্গল চক্ষু পাকাইয়া বদ্ধমুষ্টি আস্ফালন করিয়া বলিল, "জাত আমাদের মারে কে? ধর্ম্ম আমাদের লোহায় গড়া। নি এস চাচার ভাত, শ্রীদুর্গা বলে তাই খাব।" চাচা কি মানুষ নয়? শিখ হিন্দু পুলিশরা তো বেজায় খাপ্পা, বলে, "জাত দেবে বাবু! আচ্ছা, আমরা রেঁধে দিই।" আমরা তখন ভাতমুখো বাঙ্গালী,— বনবরাহের গোঁ! ভাত পাইলেই হইল, বলিলাম, "তথাস্তু"। তাহার পর কে যে দিল, অন্তর্যামীই জানেন; আমরা (সেই) সকালে চিঁড়ে ও বিকালে দিব্য কুমড়ার তরকারী দিয়া অন্ন সেবা করিলাম। অবিনাশের গলায় tubercular glands পাকিয়াছিল; আমরা তাহার নাম দিয়াছিলাম "অবির গাঁজ"। সে ডাক্তারের কাছে দুধ পাইল।

তাহার পর ডেকে উঠার পালা। সরু খাড়া কাঠের সিঁড়ি দিয়া ডেকে হাওয়া খাইতে উঠিলাম, বেড়ি লইয়া সে উঠা এক কর্ম্মভোগ আর কি! কিন্তু উপরে গিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম তাহা অনুপম—বর্ণনার অতীত। চারিদিকে কোথায়ও কূল নাই, শুধু ঢেউভাঙা নীল জল, আর তাই ছুঁইয়া "চুম্বননত" নীলাম্বর খানি। আহা উপরে সে যে কি শান্ত মধুর উধাও অনন্ত, নীচে সে কি নয়নরঞ্জন নীল নর্ত্তিত নবঘন বিথার! সে—

"মহা গভীর নীরপূর পাপধূতভূতলম্।
ধ্বনৎসমস্তপাতকারিদারিতাপদাচলম্॥
জগল্লয়ে মহাভয়ে—"

নর্ম্মদার মত সে সাগর ছবি বড় শরণপ্রদ—বড় ভাবমাখা! আমরা সে ঘরে সাতটি, আর আমাদের পাশের ঘরে সাত জন হতভাগী মেয়ে-কয়েদী দ্বীপান্তরের সাজা মাথায় করিয়া আমাদেরই মত বুঝি আরও অধিক অকূলে ভাসিয়াছে! আন্দামান কেমন এই ব্যাপারটা জানিবার জন্য তখন বড় ব্যাকুলতা। সিপাই সান্ত্রীরা আন্দামান নিকোবার পুলিশের লোক, তাহারা কিছু কিছু বিবরণ বলিল।

পনরই তারিখের সকালে সেই নীলিম প্রসারের বুকে কালো রেখায় কূল দেখা দিল। বেলা এগারটার সময়ে আমাদিগকে ডেকে লইয়া গেল। তখন অকূলের অনন্ত বুক গুটাইয়া আসিয়াছে, দু'ধারে সারি সারি প্রকৃতির কাননসুলভ স্বপ্নচ্ছবি ইন্দ্রজাল রচিয়াছে। বনকুন্তলা গিরিজটাময়ী সে মাটির কি রূপ! এত সুন্দরে কি এমন শৃঙ্খলকঠিন বন্ধন সম্ভবে! এই অনুপমাই কি সেই মানুষধরা কল ব্যাধের ফাঁদ আন্দামান!! দেখিয়া বিশ্বাস করিতে প্রাণ চাহে না। তবু তো এ সংসারে এমনই কত রূপসীর রূপের ফাঁদে কত মৃত্যু কত পাপ লুকাইয়া রহিয়াছে! পঙ্কে কমল ফুটাইয়া কমলের মৃণালে বিষধরের বেড় দিয়াই তো লীলাময়ের লীলা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অকূলের পরিচয়।

আন্দামান ও নিকোবার বঙ্গোপসাগরের বুকে কতকগুলি দ্বীপ,—এক ছড়া ছেঁড়া মালার মত লম্বাভাবে সারি সারি পড়িয়া আছে। হুগলীর মোহনা হইতে ৫৯০ মাইল দূরে এই দ্বীপমালার আরম্ভ। ভারত মহাদেশের যে কোন্‌টুকু আন্দামানের সব চেয়ে কাছে, তাহা ব্রহ্মদেশের নেগ্রেস্ অন্তরীপ; আন্দামান হইতে মাত্র ১৬০ মাইল ব্যবধান। এই ১৬০ মাইল জলের মধ্যে আবার দুই দল (group) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, তাহাদের নাম পেপারিস্ আর কোকো, ঠিক মাঝ পথে পেপারিস্ এবং আন্দামানের কোল ঘেঁসিয়া কোকো। কোকো আবার দুইটি, বড় কোকো আর ছোট কোকো।

আন্দামান প্রধানতঃ চারিটি দ্বীপ, তাহারা উত্তর দক্ষিণে সারি বাঁধিয়া হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভারতের দিক দিয়া যাইতে হইলে, প্রথমে উত্তর আন্দামান (North Andaman), মাঝে মধ্য আন্দামান (Middle Andaman) এবং শেষে দক্ষিণ আন্দামান (South Andaman) পাওয়া যায়। মানচিত্রে দেখিতে তিনটিই ঘেঁসাঘেঁসি ডিম্বাকার, আর দক্ষিণ আন্দামানের আরও দক্ষিণে একটি মটরের দানার মত ছোট রটল্যাণ্ড দ্বীপ। এই চারিটির আশে পাশে সরিষার দানার মত ছড়ান অসংখ্য দীপপুঞ্জ আছে। তাহাদের মধ্যে প্রধান দুই চারিটির নাম করিলেই চলিবে। উত্তর এবং মধ্য আন্দামানের পশ্চিম কোলে ইণ্টার্ভিউ দ্বীপ, তদ্ব্যতীত মধ্য এবং দক্ষিণ আন্দামানের পাশে পূর্ব্ব দিকে হ্যাভেলক্ ও আরকিপেলেগো দ্বীপ।

উত্তর আন্দামান ৫১ মাইল লম্বা, মধ্য আন্দামান ৫৯ মাইল, দক্ষিণ আন্দামান ৪৯ মাইল, এবং রটল্যাণ্ড মাত্র ১১ মাইল লম্বা। এই চারিটি

দ্বীপের নাম বড় বা গ্রেট আন্দামান। এই দ্বীপপুঞ্জের ২৮ মাইল দক্ষিণে ছোট আন্দামান (Little Andaman) অবস্থিত; তাহা দৈর্ঘ্যে ৩০ মাইল ও প্রস্থে ১৭ মাইল মাত্র।

দ্বীপগুলিময় বন আর পাহাড়। এ ভূমি যেমন পাষাণী, তেমনি রূপসী; আপনার ভাবে আপনি পাগল নীল সিন্ধুর বুকে বনকুন্তলে অর্দ্ধখানি অঙ্গ ঢাকিয়া বড় প্রেমে রূপসী ডুবিয়া ভাসিতেছে। কবে যে সুন্দরী স্নান করিতে নামিয়াছিল, সে সুখের জলকেলী আজও ফুরাইল না। গিরিবালার কক্ষের কলসি বুঝি কালো ঢেউয়ে নীল অকূলের বুকে ভাসিয়া গিয়াছে, স্নানরতা বনরাণীর সে দিকে লক্ষ্যই নাই।

এই গিরিজটার সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শৃঙ্গ উত্তর আন্দামানে,—স্যাডল্ মাউণ্টেন্ Saddle Mountain; উচ্চতা ৩০০০ ফিট।

ষড় ঋতুর খেলা এখানে বড় বিচিত্র। বর্ষা তো এক রকম লাগিয়াই আছে। আর আছে গ্রীষ্ম। বাকি ঋতুগুলি এই দুইটির আগে পাছে কবে যে অতর্কিত-পদে আসিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিয়া যায়, তাহা সকল সময়ে ধরিতে পারা যায় না। কেবল গ্রীষ্মকাল ও শীতের নাতিশীতোষ্ণ মাস কয়টি ছাড়া আর প্রায় সব ঋতু গুলিই বর্ষায় অল্প বিস্তর ভিজা; কখন বা পূর্ণ ঘনঘটাময়ী, আবার কখনও বা হাসি ও অশ্রুর সুখ-অভিমানে অভিমানিনী। এইরূপে আগে বর্ষা ছিল বৎসরের আটমাসব্যাপী, এখন বন জঙ্গল কতক কতক পরিষ্কার হওয়ায় কিছু কম। মোটের উপর ঋতুর কোন স্থিরতা নাই; ছয়টি ঋতু ছুটাছুটি করিয়া এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া অতর্কিতে কত কি লুকোচুরি খেলিয়া যায়।

সমুদ্রের কালো জল চারিদিক হইতে এই বনভূমির পাষাণবন্ধুর অঙ্গখানি ঘিরিয়া কত দিক দিয়াই যে ছোট ছোট প্রণালী (খাড়ি) হইয়া ভিতরে আসিয়াছে, তাহার হিসাব কিতাব নাই। এই খাড়ি গুলিতে ভাটায় গাছের

পাতা পচে, তাই এদেশে বড় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব। ম্যালেরিয়ার বাহন মশার তো এখানে অগণ্য অক্ষৌহিণী সেনা আছে। মাকড়সার মত খুব বড় বড় অদ্ভুত আকৃতির মশাও আছে, তাহারা লম্বা লম্বা পা গুলার উপর বসিয়া, ক্রমাগত দোলে; এত দ্রুত দোলে যে মশাটাকে দেখা দুষ্কর। বনের মাঝে সকালে সন্ধ্যায় মশা আর ক্ষুদে ক্ষুদে মাছির জ্বালায় দাঁড়ান যায় না, একেবারে সপ্তরথীর ট্যাক্‌টিক্সে মানুষকে অভিমন্যু বধ করিতে চায়। তাহার উপর আবার জোঁক! গাছের ডালে পাতায় ঘাসে এবং কচু বনে,—ছোট ছোট ছিনে জোঁক কোথায় নাই! রৌদ্রের তাপে তাহারা লুকাইয়া থাকে; এক পসলা বৃষ্টি যদি দৈবাৎ পড়িল তো আর রক্ষা নাই! সে অবস্থায় মানুষের গন্ধ বা সাড়া পাইলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসে, উপর হইতে টুপ টাপ করিয়া মাথায় পড়ে। তেঁতুলে বিছা এখানে সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইলে প্রায় এক হাত অবধি লম্বা ও এক ইঞ্চি মোটা হয়; দংশনে পক্ষাঘাত অবধি হইতে দেখা গিয়াছে। সর্পের বিষ এখানে মারাত্মক নহে। গোখুরা প্রায় নাই! এক প্রকার খুব ছোট সাপ ছিল, তাহার নাম (viper)। তাহার বিষে মৃত্যু অনিবার্য্য। এখন কোথায়ও কোথায়ও গভীর বনে এ সাপ আছে। আন্দামান প্রধানতঃ রকমারি কীট পতঙ্গেরই দেশ।

বন্য পাখী এখানে প্রায় ছিল না। যাহা ছিল, তাহা আবার নিকটে ভারতের উপকূলে পাওয়া যায় না; আন্দামানের Artamas ও Oriolus দূরবর্ত্তী জাভায় দেখা যায়। এখানকার শ্রাইক (Shrike) পাখীও চীন দেশে এবং ফিলিপাইন দ্বীপে পাওয়া যায়। পায়রা মাছরাঙ্গা ও কাঠঠোক্‌রা কিছু কিছু ছিল। এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিবার পর গভর্ণমেণ্ট কয়েক খাঁচা শালিক কাক চড়ুই ময়না টিয়া খয়রা চিল বাজ বক প্রভৃতি আনিয়া ছাড়িয়া দেন, এখন তাহারা সংখ্যায় বাড়িতেছে। ময়ূরও আনা হইয়াছে। এক রকম বাদুড়ও (Small frugiforous bat) পূর্ব্ব হইতেই আছে।

বন্য পশুর মধ্যে ছিল শূকর, বন বিড়াল এবং পিঠে এক সার বড় বড় রোঁওয়ালা একরকম ইন্দুর। এখন গৃহপালিত গো মহিষ ছাগল ইত্যাদি এবং বন্য হরিণ শৃগাল কুকুর আনিয়া বসবাস করান হইয়াছে; তাহারা আমাদেরই মত চির জন্মের জন্য দ্বীপান্তরিত। ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু এখানে আদৌ নাই। সামুদ্রিক জীবের যে কত বৈচিত্র্য, কত জাতি, তাহার কে ইয়ত্তা করিবে? শঙ্খ, সিপি (mother of pearl), গুগলি, শামুক ও কচ্ছপের ইন্দ্রধনুজিনি রূপ দেখিলে পাগল হইতে হয়; কত যে অদ্ভুত আকার, কত যে বর্ণ-বৈচিত্র্য, তাহা আর কি বলিব! ঘোড়া মাছ আছে, তাহার মুখ ঠিক ঘোড়ার মত। প্রকৃতির এ কি পরিহাস, কে জানে! দীর্ঘচঞ্চু কাক মাছ, মকরের মত "বদমাইস" মাছ নরমুণ্ডের মত গোল ব্লাডার Bladder মাছ, এক টুকরা স্বচ্ছ বরফের মত জেলি Jelley মাছ—কত নাম করিব? হাঙ্গর নক্র অপর্য্যাপ্ত। শঙ্কর মৎস্যও প্রচুর, তাহার লেজে সুন্দর চাবুক হয়; লেজের এক ঝাপটায় পায়ের মাংস কাটিয়া হাড় ভাঙ্গিয়া দিতে পারে; ব্লাডার ফিস্ ভয় পাইলে ফুলিয়া কাটা নরমুণ্ডের মত হইয়া ফুৎকারে মুখ দিয়া জল ছড়ায়, আর ড্যাব ড্যাব করিয়া চাহিয়া থাকে। এক রকম মাছ আছে, তাহা ভয় পাইলে খানিকটা কালি ঢালিয়া জলটা ঘোলা করিয়া দিয়া পলায়।

এখানকার উৎপন্ন পণ্য দ্রব্য বেশী নয়। পোর্ট ব্লেয়ার ও নিকোবার নারিকেলপ্রধান স্থান; বনের শাল, গর্জ্জন, পাডুক, (Padouk), কোকো প্রভৃতি মূল্যবান্ কাঠ আর নারিকেলই এ দেশের ব্যবসার আসল পণ্য। এ বনভূমির সামান্য অংশেই লোক জনের বসতি ও চাষ আবাদ হয়; সেই-টুকুর নাম পোর্ট ব্লেয়ার; মধ্য ও উত্তর আন্দামানে বসতি করিবার ছোট ছোট সরকারী আয়োজন হইতেছে। এই বিশাল দ্বীপমালার বাকি সমস্ত ভাগই গভীর ও প্রায় দুর্ভেদ্য বনপ্রদেশ; সরকারী জঙ্গল-বিভাগ—Forest

Department এই সমস্ত বন মাপিয়া তাহার নক্সা তৈয়ার করিয়াছেন; প্রত্যেক মাইলে কয়টি গাছ আছে, কোথায় পানীয় জলের কুণ্ড বা নির্ঝর পাওয়া যায়, এ সব সেই নক্সাগুলিতে দেওয়া আছে। এই সব নক্সার অধিকাংশই হেমদা'র আঁকা।

আর এক প্রকার সরকারী একচেটে ব্যবসা (monopoly) আছে; সে পণ্যের নাম Edible bird's nest। কালো কালো ছোট Swift পাখী মুখের লালা দিয়া এক রকম সাদা বাসা তৈয়ারী করে, এই বাসা ধাতুদৌর্ব্বল্যের ঔষধ। Edible bird's nest সাদা মোমের মত জিনিস, খাইতে কোন আস্বাদ নাই, দুগ্ধের সহিত খাইতে হয়। রেঙ্গুন ও চীনদেশে ইহার বিশেষ প্রচলন।

পোর্ট ব্লেয়ারে প্রথম বন্দী-উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়াসের ইতিহাস সিপাহী যুদ্ধের সময়ের কথা। তাহার পূর্ব্বের সব অস্পষ্ট ইতিবৃত্ত।

আরব ভ্রমণকারী, মারকোপোলো ও নিকোলো কন্টি প্রভৃতির লেখায় আন্দামানের নাম পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের ৪র্থ রেগুলেশন নিজামৎ আদালৎকে প্রথম সমুদ্রপারে দ্বীপান্তরের সাজা দেবার ক্ষমতা দিয়াছিল। তখন সিঙ্গাপুর, পেনাঙ্গ, মলাক্কা, টেনাসেরিম প্রভৃতি ছিল দ্বীপান্তরের দ্বীপ। ১৭৮৮—৮৯ খৃষ্টাব্দে আন্দামানে দ্বীপান্তরের উপনিবেশ করিবার প্রথম চেষ্টা, এঞ্জিনিয়ার কোল্‌ব্রুক ও কাপ্তান ব্লেয়ার এই চেষ্টার উদ্যোগী। দক্ষিণ আন্দামানের চাথাম দ্বীপে আর উত্তর আন্দামানের কর্ণওয়ালিস্ বন্দরে দুইবার দ্বীপান্তরের আড্ডা করা হয়, এবং দুইবারই তুলিয়া দিতে হয়; কারণ তখন এ সব অস্বাস্থ্যকর জায়গায় মানুষ বাঁচিত না; মিউটিনির পর ডাক্তার মাউয়াট (Dr F. Mouat) আবার আসিয়া চাথামে কয়েদী রাখিবার ব্যবস্থা দেন। ১৮৫৮ সালের রাজবিদ্রোহী কয়েদী লইয়াই এই নূতন নগর পত্তন আরম্ভ হইল। সাধারণ কয়েদী এখানে ১৮৬৩ সালে

আসিতে আরম্ভ করে। ১৮৭০ সালে কর্ণেল হেনরি ম্যান্ বন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া খাড়ি বুঁজাইয়া আন্দামানের স্বাস্থ্য চলনসই করেন। এখানে প্রায় ১৩০০ কয়েদী এবং ৭০০ হইতে ৮০০ অবধি স্ত্রী কয়েদী থাকে। স্বাধীন লোকের (free population) সংখ্যা প্রায় দুই হাজার।

এ দেশের আদিম নিবাসীরা অসভ্য, উলঙ্গ, বুনো ; তাহাদের নাম জাররা-ওয়ালা। তাহারা অব্যর্থ তীরন্দাজ ; মানুষ দেখিলেই তীরে বিঁধিয়া মারিয়া ফেলে। মলয় দেশের সেমাং জাতের মত জাররা জাতির মানুষগুলি ছোট ছোট, বর্ণ কালো, কাণ বেশ সুগঠন ও ছোট, চুল থোপা থোপা, কোঁকড়ান ও খুব ছোট। এক রকম দীর্ঘাকৃতি লম্বা চুলওয়ালা জার্‌রা নাকি রাটল্যাণ্ড ও ইণ্টারভিউ দ্বীপের মধ্যে আছে। এরা সম্ভবতঃ অন্য জাতির সঙ্গে সং-মিশ্রণের ফল। সাধারণ জার্‌রা মাথায় প্রায় ৪॥০ ফিট উচ্চ ; উলঙ্গ, উল্কিধারী ও বিরলশ্মশ্রু ; সাদা ও লাল মাটি দিয়া ইহারা সারা গায়ে চিত্র বিচিত্র করে। ইহাদের আহার মাছ কচ্ছপ মধু ও বন্য ফল। এরা বীরের জাত, ছয় ফিট লম্বা শক্ত কাঠের ধনুকে তীর একবার যোজনা করিলে আর রক্ষা নাই ; বনের পশুর মত এমন অলক্ষ্যে এত নিঃশব্দে আসে, যে, তাহাদের আদৌ দেখা যায় না ; অথচ তাহারা দূর হইতে দেখিয়াই অব্যর্থ সন্ধানে তীর মারে। ইংরাজ শক্তির সহিত ইহাদের আজও সন্ধি হয় নাই ; রাইফেল ও তোপের ভয়ে এরা দূরে দূরে বনের মধ্যে থাকে, কখন কখন বনের ধারে আসিয়া দুই একটা মানুষ মারিবার পর তাড়া খাইয়া চলিয়া যায়। এরা একপত্নীক, সন্তরণপটু, সংখ্যায় বোধ হয় ৮০০০।১০০০০ হাজার হইবে।

পোর্ট ব্লেয়ারের পত্তনের পাঁচ বছর পরে এক দল বুনো ইংরাজের কাছে পোষ মানে। ইহাদের নাম এখন আর জার্‌রা নহে, ইহাদের জংলী বলে। আসল জার্‌রা ইহাদের দেখিলেও প্রাণে মারিতে ছাড়ে না। সরকার বাহাদুর

ইহাদের জন্য কতকগুলি ব্যারাক তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন ; বনে বনে ঘুরিয়া মধু, কচ্ছপের হাড়, শাঁক, কড়ি, ঝিনুক (mother of pearl) এমনি বনজাত ও সামুদ্রিক কত জিনিস লইয়া ইহারা এই জংলী ব্যারাকে আসিয়া থাকে। জংলী ব্যারাকের মুন্সী সেই সব জিনিস লইয়া তাহার বদলে তামাক চা চিনি কাঁচের মালা এই রকম যে যাহা চায়, দেয় ; আর তাহাদের আনীত জিনিষগুলি বিক্রয়ের জন্য গুদামে রাখে এবং রসের show roomএ পাঠায়। এই থানে ইহারা আট দশ দিন থাকিয়া শ্রান্তি দূর হইলে আবার বন ঘুরিতে বাহির হয়। ইহাদের পুরুষরা একটা তিন চার ইঞ্চি চওড়া কাপড়ের লেংটি পরে। মেয়েরা গাছের পাতা পরে, কোন কোন গাছের তলতা বা আঁসের বিনানীর এক রকম ঝালরও পরে ! এটা ক্রমিক সভ্যতার লক্ষণ। এই জংলী ব্যারাকে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে দেখিয়াছি, কাহারও বাপ ছিল উড়ে, কাহারও বা সাহেব। একটি মেয়ে—সম্ভবতঃ কোন শ্বেতাঙ্গের ঔরসজাত হইবে, সে এত সুন্দরী যে জংলী বলিয়া বোধ হয় না। সে প্রায়ই সভ্যতার ছাই পাঁশ কাপড় চোপড় ফেলিয়া দিয়া পালায়, আর মনের সুখে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়। মুক্ত আকাশের পাখীর স্বভাব তাহার আর গেল না।

ইহাদের ভাষা দুর্ব্বোধ্য, একটু আনুনাসিক, শব্দ-বহুল মোটেই নহে। গলার স্বর খুব ক্ষীণ, মেম সাহেবদের যাহা অভ্যাস করিয়া মিহি করিতে হয়, ইহাদের তাহা স্বভাবদত্ত।

জংলীব্যারাক সোর পেট (Shore Point) ষ্টেসনের কাছে, জংলী হাঁসপাতাল হদ্দুর (Haddo Station) কাছে। আজ অবধি দুই জন জংলী মেয়ে ইংরাজি শিখিয়া খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে, তাহাদের একজন জংলী হাঁসপাতালের অধ্যক্ষ (matron) এবং অপর জন চীফ কমিসনারের স্ত্রীর সহচরী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সেটলমেণ্টের পরিচয়।

জেলের একটা মোটামুটি স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছে। এখন জেলের বাহিরের ব্যবস্থাটা একবার বর্ণনা করা দরকার। মাহারাজা জাহাজই কয়েদী আনিতে, প্রতি চল্লিশ দিনে একবার করিয়া কলিকাতায় যায়, এই চল্লিশ দিনের মধ্যে দুই বার রেঙ্গুন ও একবার মান্দ্রাজ হইয়া আসে। ধরা যাউক একটা কলিকাতা চালান ১০০ জন কয়েদী লইয়া আসিল; এই কলিকাতা চালান বাঙ্গালী পাঞ্জাবী হিন্দুস্থানী উড়িয়া মান্দ্রাজী ও আসামীর চালান। আমাদের সময়ে তখন সাধারণ কয়েদীর চালান আসিলে প্রথম প্রথম তাহাদিগকে হোপ টাউনের কাছে, প্লেগ-ক্যাম্পে (Quarrantine Campএ) নামান হইত। এই ক্যাম্প মাউণ্ট হ্যারিয়েটের ঠিক নীচে, একজন কয়েদী কম্পাউণ্ডার ও এক জন কয়েদী জমাদারের অধীন; যখন এখানে নূতন চালান থাকে, তখন অন্য কয়েদী আসা নিষেধ। পোর্ট ব্লেয়ারে কোন প্লেগ বা ঐরূপ সংক্রামক ব্যারাম না আসে, সেই জন্য নূতন চালানকে এই ভাবে দুই সপ্তাহ আটক রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। কয়েদীরা এখানে এই কয় দিন যেমন অবস্থায় আসিত, তেমনি বেড়ি পায়ে পড়িয়া থাকিত, ও মাঝে মাঝে ঘাস কাটা, রাস্তা সাফ করা,— এমনি কিছু কিছু সামান্য কাজ করিত।

ষোল দিনের দিন এই চালান প্লেগ ক্যাম্প হইতে জেলে আসিবার নিয়ম। ইহাদের জেলে আসা সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! বিছানা পত্রের মোট ঘাড়ে কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ এই নূতন দল ঝমর ঝম্ ঝমর ঝম্ মল বাজাইয়া ভয়ে জুল জুল করিয়া চাহিতে চাহিতে সারি সারি আসে। আগে পিছনে আশে পাশে লাল

পাগড়ি ওয়ার্ডারের দল "এই ইধর্", "সিধা চলো", "বৈঠ যাও", "সরকার," এমনি নানা রবে সেই নবাগত ভয়বিত্রস্ত গরুর পালকে তাড়াইয়া আনে। এত বড় কেল্লার মত বাড়ী! কালো উর্দ্দিপরা পেটি অফিসার জমাদার টিণ্ডালের লগুড়হস্ত লালপাগড়ি মূর্ত্তি আর ওয়ার্ডারদিগের ভীম চিৎকারে বেচারীদের আত্মাপক্ষী প্রায় খাঁচা ছাড়া হইবার দাখিল হয় আর কি! তাহার পর বেড়ি কাটা ও কাপড় ছাড়ার ধূম, এবং পর দিবস মারে সাহেবের ডাক্তারী হিসাবে পরীক্ষার পর ব্যারী সাহেবের কাজ দেওয়া (কামান বাঁট্না)। সে কামান না কামান একেবারে তোপ! প্রকাণ্ড ভুঁড়ি বোঁচা নাক রক্তবর্ণ মুখে সেই খোঁচা খোঁচা দুর্ব্বার গোঁফের ঝোড়া লইয়া একটা মোটা চার ইঞ্চি বর্ম্মা চুরুট মুখে লাঠি বগলে এই জেলখানার যমরাজটি সেই সারিবাঁধা fileএর সাম্‌নে দিয়া আস্তে আস্তে চলিতে থাকেন, আর টিকিটে লিখিতে লিখিতে বলিতে বলিতে যান, 'ছে মহিনা কোঠলি বন্ধ্, দো পাউণ্ড ছিল্‌কা কুটো" ; "এক সাল্ জেল বন্ধ্, হাঁথ্ কলু পিষো" ; দো সাল্ জেল বন্ধ্, ছে মহিনা কোঠলি বন্ধ্, সাব্বল চালাও"; "ছে মহিনা জেল বন্ধ্, তিন পাঁউণ্ড রস্‌সি বাটো", "ছে মহিনা জেল বন্ধ্, পানিওয়ালা তিন নম্বর" ইত্যাদি। যাহারা কলুর কাজ পাইল, তাহাদের সে রাত্র দুশ্চিন্তায় নিদ্রা হইবে না; যাহারা পানিওয়ালা কি ঝাড়ুওয়ালা হইল বা রসি পাইল তাহারা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। আর যাহারা ছিল্‌কা কুটিবার কাজে বাহাল হইল, তাহারা বাঁচিল কি মরিল, তাহা বুঝিতে না পারিয়া সংশয়ে দুলিতে লাগিল, কারণ ছিলকা কলু হইতে হালকা হইলেও তবু শক্ত কাজ ত বটে।

এই রকমে সুখে দুঃখে ছয় মাস বা এক বৎসর যাহার যে 'সাজা' কাটিয়া এক দিন ইহারা জেল হইতে ছাড়পত্র লইয়া 'রেহাই' পাইয়া বাহির হয়। তখন আর ইহারা পূর্ব্বের সে ভয়ত্রস্ত আনাড়ি সরল মানুষ নাই, অনেক সহিয়া ঠকিয়া ঠকাইয়া ওস্তাদ পুরাণ কয়েদীর (Jail-bird) হাতে শিক্ষা লাভ

করিয়া ঠিক শঠচুড়ামণি না হইলেও সেই পথে বেশ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। যে দিন ইহাদের 'জেল-রেহাই' হইবে তাহার পূর্ব্ব দিন এবার্ডিন ষ্টেসনে টেলিফোন পাইয়া সেখান হইতে একজন টিণ্ডাল ও চার পাঁচ জন পেটি অফিসার চালান লইতে জেলের ফটকে আসিয়া হাজির হয়। কয়েদীরা দেশীয় জেল হইতে ধুতি কুর্ত্তা ও পাগড়ি পরিয়া আসে, এখানে জাঙ্গিয়া কুর্ত্তা ও টুপী পরিয়া জেলে ঢোকে, আবার রেহাই হইবার সময়ে সে পোষাক ছাড়িয়া পুরাণ স্থট সেই হাঁটুর উপর অবধি ধারিদার ধুতি কুর্ত্তা ও পাগড়ি পরিয়া পুনর্মূষিক হয়! জেলের চিফ ওভারসিয়ার ব্যারি সাহেব ও গেট-কিপার (gate-keeper) মায় বিছানা, বাসন, কাপড় এই ষাট সত্তর বা আশী জনকে সেই বাহিরের টিণ্ডালের হাতে সঁপিয়া দেন। তাহারা ইহাদিগকে "জোড়া জোড়া হো যাও", "খাড়া হো যাও" ইত্যাদি রবে আবার সচকিত সন্ত্রস্ত করিয়া মোট ঘাড়ে দিয়া টাপু বা ষ্টেসনে লইয়া চলে। টাপুতে পূর্ব্ব দিনই উপরওয়ালার হুকুম আনাইয়া রাখা হইয়াছে, মুন্সী ও জমাদার সেই অর্ডার অনুযায়ী এই আশী জনকে ভাগ করিয়া দশ জন বার জন করিয়া এক এক টাপুতে পাঠায়।

পোর্ট ব্লেয়ার তখন চারটা জেলায় বিভক্ত ছিল,— রস জেলা, পূর্ব্ব জেলা (Eastern District), পশ্চিম জেলা (Western District) এবং জেল ডিস্‌ট্রিক্ট। রস দ্বীপ রাজধানী বলিয়া নিজেই এক জেলা। পূর্ব্ব জেলায় এই কয়টি টাপু বা ষ্টেসন আছে,—এবার্ডিন, ফিনিক্স বে, মিডল পয়েণ্ট, নেভি বে, পাহাড় গাঁও ও হ্যাডো। এবার্ডিনের বিশেষ কাজ রাস্তাঘাট তৈয়ারী, ইঞ্জিনিয়ারিং গুদাম, নারিকেল ফাইল, জেটিতে মাল বোঝাই, পাথর ভাঙ্গা ও ঝাড়ু দেওয়া। ফিনিক্সবেতে প্রকাণ্ড সরকারী কারখানা, সে কারখানায় লোহা পিতল ঝিনুক কচ্ছপের হাড় ও কাঠ হইতে নানা শিল্পজাত জিনিষ তৈয়ার হয়, তিন চার শ' লোক খাটে। তাহা ছাড়া টাপুর সাধারণ কাজ যেমন

সেলুলার জেল হইতে আন্দামান রাজধানী রস্ দ্বীপের দৃশ্য—

১। চীফ্ কমিশনারের বাড়ী। ২। রস হাসপাতাল। ৩। রস জেঠি।
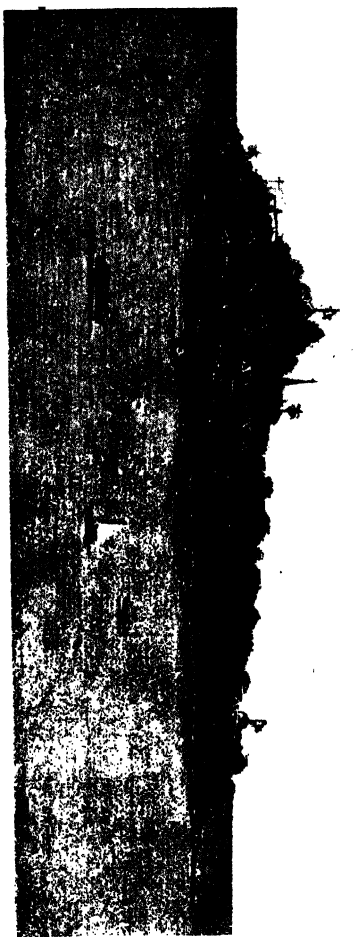
ঝাড়ু দেওয়া, রাস্তা তৈয়ারা করা, পাথর ভাঙ্গা, জল বহা, নারিকেল ফাইল এ সব তো আছেই। মিডল্ পয়েণ্টের (কয়েদীর রাখা) নাম, ছোলদারী; এখানকার লোক সাধারণ টাপুর কাজ ছাড়া হরত বা Haddo বাগানে ও তথাকার ইঞ্জিনিয়ারিং গুদামেও কাজ করিতে যায়। নেভি-বে টাপুতে বেশ বড় শাক-সবজি ও ফলের বাগান আছে, সমুদ্রের বাঁধ মেরামতের কাজও আছে। পাহাড়-গাঁও হইতে ঐ বাগানে কয়েদীরা জন খাটিতে আসে, বাঁধেও যায়, জঙ্গলে বেত বাঁশ কাটিতেও যায়। হরতুতে বাগান, ইঞ্জিনিয়ারিং গুদাম ও বড় হাঁসপাতাল আছে।

তাহার পর পশ্চিম জেলায় এই কয়টি টাপু আছে,—চ্যাথাম্, শোর পয়েণ্ট, জংলী ব্যারাক, ডাণ্ডাস্‌পয়েণ্ট, ভাইপার, উইম্বার্লিগঞ্জ, কালাটাং এবং ব্যারাটাং।* চ্যাথামে প্রসিদ্ধ কাঠের কারখানা (Saw mill), এখানে সমস্ত আন্দামানী ফরেষ্ট বা বনবিভাগের কাঠ মেসিনে কাটিয়া তক্তা, ব্যাটাম, কড়ি ও বরগা তৈয়ার হয়। সোরপেট বা শোর পয়েণ্টে মাছের ফাইল নারিকেল ফাইল (gang) ও ইঞ্জিনিয়ারিং গুদাম আছে, অন্যান্য সাধারণ কাজ তো আছেই। জংলী ব্যারাকের কথা এ দেশের বুনোদের প্রসঙ্গে বলিয়াছি। ডাণ্ডাস্‌পেট (Dundas point) ইটের পাঁজা ও কারখানার (Brick kiln) জন্য বিখ্যাত, এখানে কয়েক শত লোক খাটে; টাপুর সাধারণ কাজ খুব কম। ভাইপার পশ্চিম জেলার রাজধানী, এখানে ডিষ্ট্রীক্ট অফিসারের আদালত ও বাংলা আছে। এই তরঙ্গ-বিলুব্ধ তরল নীলের বুকে বসের মত ভাইপারও একটি হরিত স্বপ্ন। এখানকার প্রধান কাজ শাকসবজির বাগান, জেটি ফাইল, খেলিবার মাঠের (Lawn) কাজ, বেত ও বাঁশ কাটা, ঝাড়ু ফাইল ও হাঁসপাতাল। উইম্বার্লি গঞ্জে দইঘর ও চেলা ফাইল আছে; এই স্থান হইতেই ঠিক বন বিভাগের আরম্ভ, বারা[illegible] অবধি তার জের যায়।

* Chatham, [illegible] Dundas Point, Viper, and Wimberleygunj.

কালাটাং ঘোর জঙ্গলের মধ্যে, এখানে বিখ্যাত যমরাজতুল্য মিণ্টো সাহেবের (Mr. Minto, Manager) চা বাগিচা, কয়েদীর পক্ষে এ স্থান বড় ভয়ের জিনিস, কারণ চা বাগিচায় বড় শক্ত কাজ। বারাটাং ঘোর বিজন বনে অবস্থিত,—বনবিভাগের এটা একটা বড় আড্ডা!

এক একটি টাপু বা ষ্টেসন মানে ৬।৭টি ব্যারাকের জমায়েৎ। প্রত্যেক টাপু এক এক জন কয়েদী-জমাদার ও কয়েদী-মুন্সীর অধীনে পরিচালিত। কয়েদী উন্নতি করিতে করিতে দশ বার বছরে গিয়া জমাদার হয়, তখন লাল পরতলা (Badge) ও পিতলের জমাদার লেখা তকমা পায়। এই তকমা আঁটা তিন ইঞ্চি চওড়া পরতলা পৈতার মত গলায় ঝুলান থাকে; জমাদার মাসে আট টাকা মাহিনা ও দৈনিক সিধা (ration) পায়। জমাদারের নীচে টিণ্ডাল (tindal), তাহার পরতলা আধা কালো আধা লাল ও টিণ্ডাল লেখা তকমা আঁটা। এক এক জন জমাদারের অধীনে টাপুতে চার পাঁচ জন টিণ্ডাল থাকে। টিণ্ডালের নীচে আবার পেটি অফিসার (Petty officer); এদের পরতলা কালো, তকমা নাই; প্রতি টাপুতে বিশ পঁচিশ জন পেটি অফিসার থাকে।

এক এক ব্যারাকে ষাট সত্তর জন কয়েদীর জায়গা আছে, ব্যারাকগুলি কাঠের তক্তার তৈয়ারী, ছাতে টাইল। কাঠের উঁচু মঞ্চের উপর তক্তা আঁটা ব্যারাকের ফ্লোর বা মেঝে; ইহার দেওয়াল বা ভীত নাই, তাহার পরিবর্তে চারিদিক কাটের ব্যাটামের জাফরী ঘেরা। ঘরে পাশাপাশি চট বিছাইয়া কম্বলের শয্যা রচনা করিয়া তিন সারি লোক শোয়। পাশে পাইখানা। প্রতি ব্যারাকে দুইটি আলো থাকে; চারজন পেটি অফিসার ও কর্ত্তা হিসাবে একজন জমাদার বা কখন কখন শুধু একজন জবাবদার টিণ্ডালই পেটি অফিসারদের সহিত পাহারা দেয়। প্রত্যেকের পালা তিন ঘণ্টা করিয়া; সন্ধ্যায় নামে মাত্র ব্যারাক বন্ধ হয়, ঠিক বন্ধ হইবার সময় রাত্র ৮টায় [illegible] পড়িবার পর।

তাহার পর আর কেহ বাহিরে যাইতে পারে না। একবার ঠিক সন্ধ্যার সময় আর একবার রাত্রি ৮টায় যে যাহার বিছানায় বসিয়া গুন্‌তি দিতে হয়।

সকালে উঠিয়া আবার সেই গুন্‌তি বা গোনার পালা, আগে আগে জবাব-দার ও পিছনে যত পেটি অফিসারেরা "আপনা আপনা বিস্তারামে বইঠ যাও" এই হাঁক মারিয়া সবাইকে বসাইয়া ভেড়া-গনা করিয়া একচোট গনিয়া যায়। তাহার পর সকলকে বাহির হইয়া শৌচক্রিয়া ও মুখ হাত ধোয়া সারিয়া লইতে হয়। এক একটা ডোল vat বা পিপা আছে, তাহাতে সমস্ত দিন খাটিয়া পাণিওয়ালারা মিষ্ট জল ভরিয়া রাখে। মিষ্ট মানে কেহ যেন কেওড়া দেওয়া চিনির সরবৎ মনে না করেন; এটা নোনা জলের দেশ, মিষ্ট জল বা মিঠা-পাণি মানেই পানীয় জল। সকলকে লোহার বাটি লইয়া এই পাণিওয়ালার কাছে যাইতে হয়, সে ছোট টিনের মগে করিয়া জল দেয়, তাহাতে মুখ হাত ধুইতে হয়।

তাহার পর ফাইল হইয়া আবার জোড়া জোড়া বসিবার পালা! শেলি লিখিয়াছিলেন "প্রেমের তত্ত্ব"—Love's Philosophy; তাহাতে কবি বলিয়াছেন—এ জগতে সব যুগল, একা কেহ নাই। পোর্ট ব্লেয়ারের পেটি অফিসার টিণ্ডেলরা এ প্রেমের দর্শন গুঁতার বলে প্রমাণ করিতে সদা ব্যস্ত, "জোড়া জোড়া হো যাও" এ রব দিবারাত্র উঠিতে বসিতে যখন তখন শুনিতে হয়। বিদ্রোহী হইয়াছ কি লাঠির খোঁচা পেটে পিঠে যেখানে হউক এক জায়গায় খাইয়াছ। ইহাদের অঙ্ক শাস্ত্রে এত গভীর জ্ঞান যে মানুষ যুগলে যুগলে না বসিলে গনিয়া উঠিতে পারে না। "রাম দো তিন" রবে বেশ গনিয়া যাইতেছে, যেই দেখিল দশ জোড়ার পরে এক হতভাগ্য একা বসিয়াছে, অমনি সব গোলোযোগ হইয়া গেল! তাহার পর সেই দুরদৃষ্ট পাতকীর উপর মুষ্টিযোগ লাঠৌষধি প্রয়োগ করিয়া এক জন

দাড়ীওয়ালার সহিত তাহার ক্ষণিক উদ্বাহবন্ধন ঘটাইয়া তবে আবার গনিবার পালা।

সকালের এই ফাইলে সব কয়টি ব্যারাক বা বিজনের কয়েদী সারে সারে জমায়েত হয়। তাহার পর "সব ঠিক" রিপোর্ট পাইলে, জমাদার ও মুন্সী টাপুর কাজ অনুসারে ফাইল ভাগ করে। এক দিক হইতে দশ কি পনর জনকে উঠাইয়া জমাদার আর এক দিকে বসাইয়া এঞ্জিনিয়ারীং ফোরম্যানের সোপরুদ্ধ করিয়া দেয়, মুন্সী অমনি তাহা লিখিয়া লয়; এই হইল P. W. D. ফাইল। তাহার পর ৩০ জনকে লইয়া জমাদার বাগানের জবাবদারের হাতে সমর্পণ করে, অমনি কাগজ কলমধারী চিত্রগুপ্ত তাহা নথীগত করে; এই হইল বাগান ফাইল। এবম্প্রকার কর্ম্মটার নাম ফাইল বাঁটা বা ভাগ করা। তাহার পর যে যাহার দল লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়া জবাবদাররা দশটা অবধি আপন মনোমত কাজে এক এক জনকে লাগাইয়া রাখিল। দশটার পর হাঁক ডাক করিয়া গনিয়া গাঁথিয়া আবার টাপুতে আগমন ও জমাদারের কাছে গুন্তি দেওয়া! তাহার পর স্নান আহার ও বেলা একটা অবধি বিশ্রাম। একটার পর আবার ফাইল, যে যার পেটি অফিসার বা টিণ্ডালের অধীনে দল বাঁধা ও কাজে যাত্রা। বিকাল ৪।৫ টার সময় ছুটি। ৫টায় আহারের জন্য থালা বাটী পাতিয়া সারে সারে বসিয়া যাওয়া, আহার করা ও সন্ধ্যা অবধি টাপুর কাছে মনের সুখে ঘুরা ফিরা এবং গল্প গুজব করা!

দশটায় খাওয়ার পর ও বৈকালে ব্যারাক বন্ধ না হওয়া অবধি গাঁজাখোরের লুকাইয়া দু'টা দম দিবার অবসর; জুয়াড়ির জুয়ার মাহেন্দ্রক্ষণ; অর্থলোভীর মাছ ধরিয়া বনে পান তুলিয়া কত ছুতা নাতায় দু'পয়সা উপার্জ্জন করিবার সুবিধা; এবং জমাদার মুন্সী টিণ্ডাল মেট (রসদের গুদামের মালিক বা রেশন-মেট) হেড্ ভাণ্ডারী প্রভৃতি প্রত্যেকের চাটুকারের দলের সমাবেশ, এবং স্ব স্ব পালকের তেলা পায়ে তৈল প্রদান বা মোসাহেবী করা।

রবিবারে কাজ কর্ম্ম নাই, সকালে টাপুর চতুর্দ্দিকের ঘাস আবর্জ্জনা পরিষ্কার মাত্র দুই এক ঘণ্টা করিতে হয়। সমস্ত দিন শুইয়া বসিয়া থাকিতে পার; অথবা জমাদার কি টিণ্ডালকে বা তোমার ব্যারাকের জবাবদারকে দু'চার আনায় অথবা কেবল মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া অন্য টাপুতে বন্ধুসম্মিলনের আশায় পগার ডিঙ্গাইতে পার। এই তো গেল মোটামুটি বাহিরের জীবন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সেলুলারে—প্রথম জীবন।

আমাদের জাহাজ আসিয়া বন্দরে দাঁড়াইল। ইহার উত্তরে রস্ (Ross) দ্বীপ; দক্ষিণে এবার্ডিন জেঠি ও বিরাট দুর্গের মত সেলুলার জেল; পূর্ব্বে মাউণ্ট হ্যারিয়েট পাহাড়ের কান্ত শ্যামশোভা; আর পশ্চিমে সমুদ্রের অকূল রূপ। আমাদের এ অকূলের তরী কোথায় ভিড়িল কে জানে? সকল কূল হারাইয়া এমনি করিয়াই কি আমরা চিরদিন কূল পাইব? কূল পাই আর না পাই, এ স্বভাব-নিকুঞ্জে প্রকৃতির বড় মোহিনী সাজ। বন্দর-বক্ষ হইতে রসের বড় বাহার, পাহাড়ের গায়ে স্তরে বিস্তরে যেন অযত্নবিন্যস্ত কত সাদা সাদা রাঙ্গা রাঙ্গা বাড়ী ঘরগুলির সঙ্গে গাছ পালা সবুজের জড়াজড়ি মাথামাথি। দূর হইতে কেহ কখন সিলং সহর যদি দেখিয়া থাকেন, তবে বুঝিবেন এও কতকটা সেই রকম। পার্থক্যের মধ্যে এখানে গিরিছবির চারিদিকে তরল নীল রঙের ছড়াছড়ি—তরঙ্গপাগল সাগরের অনাবৃত উচ্ছসিত বুকখানার মত্ত পাগল দোল। রসের জল ছুঁইয়া কালো জেঠী, নীচে হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া থাকের পর থাকে বাড়ীগুলি গাছ পালার সহিত কোলাকুলি করিয়া বসিয়া আছে; সবার উপর চিফ্ কমিশনার সাহেবের আবাস, ছাদ তাহার রাঙ্গা টাইলের। সেখানে একটি নিশান ওড়ে; চিফ্ অনুপস্থিত থাকিলে সে ইউনিয়ান্ জ্যাক নামাইয়া রাখা হয়। রসের পশ্চিম কোণে প্রায় সমুদ্রের কোলের মাঝে গোরা ব্যারক বা ইউরোপীয় পল্টনের ছাউনী। কোন জাহাজ বন্দরে আসিতেছে সংবাদ আসিলে এই কোণে যে একটী উচু থাম্বা

আছে তাহার মাথায় লাল নিশান উড়ান হয়। বড়দিনে, রাজার জন্মদিনে বা ঐরূপ কোন রাজকীয় উৎসবে (State occasion) এই থাম্বাটী রঙ বেরঙের নিশানের মালা পরিয়া উৎসব সাজে দাঁড়ায়।

দক্ষিণ আন্দামানে সর্ব্বাপেক্ষা তুঙ্গ শৃঙ্গটির নাম মাউণ্ট হ্যারিয়েট, এইটি হইল এখানকার শিমলা পাহাড় বা গ্রীষ্মাবাস। এই পাহাড়ের মাথার উপর অনেকগুলি বাংলা আছে, অসুস্থ হইলে বা বড় গরমের দিনে চিফ কমিশনার ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীরা এখানে আসিয়া দু' চার সপ্তাহ থাকিয়া যান। মণিপুর যুদ্ধের শাস্তিপ্রাপ্ত কয়েদীরা রাজবন্দীরূপে (State Prisoner) তখন এইখানে আছে, সরকার হইতে তাহারা থাকিবার বাড়ী ও কিছু জমিজমা পাইয়াছে এবং প্রতিমাসে মাসহারা ও দৈনিক সিধা (ration) পায়। (পরে শান্তি উৎসবে ও রাজ-ঘোষণার ফলে ইহাদের মুক্তি হইয়াছিল।) মাউণ্ট হ্যারিয়েট বনে বনময়, যেন এক বিশালদেহ লোমশ ভল্লুক দুইটি থাবার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে। বনের কোথাও কালো গাঢ় নীল রঙ, কোথায়ও নিম বাঁশ তেঁতুলের ফিকা হরিত জাল বুনানি এবং কোথায়ও কোথায়ও বনের গা তামাটে পাতায় রাঙা। পাহাড়ের বুক ফাটিয়া একটি রজতের ধারা স্রোতস্বিনী হইয়া নামিয়া গিরিরাজের পাদদেশ বেড়িয়া বেড়িয়া কলস্বনে সমুদ্রের সন্ধানে গিয়াছে; এ সাগর বুকের হারান বনটুকুর মধ্যে এই বনচারিণী অমন করিয়া আকুল ব্যাকুল সোহাগে কাহার কাণে কাণে কি প্রেম বেদনা বলিতে চায় কে জানে?

একটি ষ্টীম্ লঞ্চ্ আমাদের জন্য এক গাধা বোটকে (lighter) নাকে দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া জাহাজে আসিয়া লাগিল। বড় ডাক্তার (Senior Medical officer), জেলার্ প্রভৃতি কত কর্ম্মচারী আসিল গেল, চারিদিকে মটর বোট, পান্সী, গাধাবোট, ষ্টীম লঞ্চের একটা ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। এই ব্যস্ততার অবসরে একবার সেলুলার জেলের একটা মোটামুটি

ধারণা করাইয়া দিই, নহিলে সেলুলার সম্বন্ধে আনাড়ি পাঠককে লইয়া সে গোলক ধাঁধায় ঢুকিলে তাঁহার ব্যূহপ্রবিষ্ট অভিমন্যুর দশা ঘটিবে।

জেলের রূপটী কতকটা এইরূপ :—মানচিত্রের মাঝখানে একটী বিন্দু, সেটী একটী তিনতলা গুম্বজ বা মিনার—তাহাকে সেণ্ট্রাল টাওয়ার বা গুমটি বলে। সেই গুমটিকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চারিদিকে যদি একটি বৃত্ত বা মণ্ডল আঁকা যায়, তাহা হইলে সেইটিকে মোটামুটি হিসাবে জেলের বহিঃ-প্রাচীর বলা যাইতে পারে। কেন্দ্রস্থ সেই গুম্বজ হইতে সাতটি ঋজুরেখা বা ব্যাসার্দ্ধ সাত দিকে গিয়া মণ্ডলটীকে ছুঁইয়াছে,—এই সপ্ত রেখাই সাতটি মহল বা block, ইহারই নাম সেলুলার জেল। গুম্বজটি যেমন তিনতলা, তেমনি প্রত্যেক মহলটি তিনতলা। প্রত্যেক তলে এক লাইনে পাশাপাশি বিশ ত্রিশটি করিয়া কুঠুরি ; কুঠুরিতে একটি করিয়া লোহার গরাদে আঁটা দরজা আছে, কবাট বা বন্ধ door leaf নাই ; পিছনে সাড়ে চার হাত উচ্চে যে ছোট জানালাটী আছে তাহাও দুই ইঞ্চি ফাঁক ফাঁক গরাদে আঁটা। ঘরে আসবাবের মধ্যে দেড় হাত চওড়া এক একখানি নীচু তক্তপোস, আর ঘরের কোণে এক একখানি আলকাতরা মাখা মাটির ভাঁড়। এই খাটে ঘুম হয় খুব সজাগ, কারণ একটু অসাবধানে পাশ ফিরিলেই ধপ্ করিয়া মাথা ঠুকিয়া গিয়া অকস্মাৎ ভূমিশয্যা লইতে হইবে। আর ঐ আল্‌কাতরা মাখা ভাঁড়টি জীবের বিষ্ঠা চন্দনে সমজ্ঞান আনিবার অপূর্ব্ব যন্ত্র, কারণ ঐটিই রাত্রের শৌচাগার, এবং তাহা লইয়া সুঘ্রাণে কুতূহলে রাত্রি বাস করিতে হয়। আর বসিবার সময় চুরাশী রকম আসনের অনেকগুলি এই ভাঁড়টির সাহায্যে অভ্যাস হইয়া যায়। এগুলি জেল বন্ধ হইবার কিছু আগে বৈকালে মেথর ঘরে দিয়া যায়, আর সকালে নিয়মিত সরাইয়া লয়।

আগেই বলিয়াছি কুঠুরিগুলি এক সারে, আর তাহাদের সম্মুখ দিয়া একটি তিন চারি হাত চওড়া বারাণ্ডা চলিয়া গিয়াছে। বারাণ্ডাটিও গরাদে

ঘেরা ; তাহার মাঝে মাঝে থাম এবং থামগুলির গায়ে খিলানের মাঝে লোহার শিকের দরজা, এ দরজা খুলিবার নয়, খিলানে আঁটা। সব দালান গুলির মুখ মাঝের গুম্বজ বা গুমটিতে গিয়া যুক্ত হইয়াছে, এইখানে লাইনে বা corridorএ প্রবেশ করিবার ফটক। রাত্রে এ ফটক বন্ধ হইয়া যায়। কুঠরীগুলি বন্ধ হয় লোহার হুড়কায় ; তালা দিবার স্থান বাহিরে দেয়ালের গায়ে ; ভিতর হইতে তালা বা হুড়কার মুখ হাতে পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্লক ত্রিতল ; উপর তলের নাম উপর লাইন বা Upper Corridor, মাঝের তল বীচ লাইন বা Middle Corridor এবং নীচের তল নীচে লাইন বা Lower Corridor। রাত্রে প্রতি লাইনে চার জন করিয়া ওয়ার্ডার থাকে ; ইহারা প্রহরী ; প্রতি তিন ঘণ্টা এক জন করিয়া হরিকেন লণ্ঠন হাতে লাইনের এমোড় ওমোড় ঘুরিতে থাকে এবং কুঠরীর দ্বিপদ পশুটা কি করিতেছে তাহা দেখিয়া যায়। সমস্ত জেলে সাতটী ব্লকের একুশটী লাইনে এক কালে একুশ জন ওয়ার্ডার পাহারায় এমনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিজের পালা ফুরাইলে অন্যকে জাগাইয়া দেয় ; এইরূপে পালাক্রমে ৮৪ জনে মিলিয়া জেলে এই দুঃসাধ্য সাধনে নিশিভোর করে। গুমটীতে একজন পুলিশ সিপাহী লণ্ঠন হাতে অবিশ্রান্ত উপগ্রহের মত উপর নীচে ঘুরিতে থাকে ; সে এক এক ব্লকের কাছে আসে, আর সেই লাইনের ওয়ার্ডার হাঁকিয়া রিপোর্ট দেয়, "বিশ তালা বন্ধ, চার ওয়ার্ডার, সব ঠিক হ্যায়।" এই পুলিশে ও লাইনের ওয়ার্ডারে ভক্ষ্য-ভক্ষক সম্বন্ধ, কারণ ওয়ার্ডার কখন দৈবাৎ বসিয়াছিল বা বাতি মাটিতে রাখিয়াছিল বলিয়া পুলিশ সান্ত্রী রিপোর্ট বা নালিশ করিলে ওয়ার্ডারকে শাস্তিভোগ করিতে হয়। সেই ভয়ে তটস্থ ওয়ার্ডার বেচারী সিপাহী সাহেবের মন হরণ করিবার আশায় যে ছলা কলা হাব ভাব ও চাতুরী কৌশলের শরণ লয়, তাহার অর্দ্ধেক ছলনা মুণিমনহারী মেনকা রম্ভারা জানিতেন কিনা সন্দেহ, জানিলে ঋষির কূল বেমালুম উজাড় হইতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই!

প্রত্যেক ব্লকের সামনে খুব বড় উঠান আছে; তাহার মাঝে দিনে কাজ করিবার একটি করিয়া কারখানা; এক পাশে জলের এক হাত চওড়া ও দশ হাত লম্বা চৌবাচ্চা বা হৌদি আর টিনের (Corrugated iron) পাইখানা। জেলের বাহিরে বাগানে সমুদ্রের ধারে এক পাম্প আছে, তাহার কিছু দূরে বাগানের মাঝে প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা; পাম্পে সমুদ্রের জল তুলিয়া চৌবাচ্চায় ভরিয়া রাখে, সেই জল নলযোগে সাতটি নম্বরের চৌবাচ্চায় যায়। এই জলে কয়েদীর স্নান করা কাপড় কাচা চলে। খাবার জলের কল গুমটির কাছে আছে, প্রত্যেক নম্বরের পানিওয়ালা সেই কলের 'মিঠাপানি' টিনে বা বাল্‌তিতে ভরিয়া রাখে।

পুলিশ-সিপাহী-ঘেরাও হইয়া আমরা জাহাজ হইতে নামিয়া গাধাবোটে বসিলাম। তাহার পর ষ্টিম্ লঞ্চ আমাদিগকে এবার্ডিন জেঠির দিকে টানিয়া লইয়া চলিল। ঘাটে পঁহুছিয়া তথা হইতে আমরা বেড়ি টানিতে টানিতে কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ উটের সারির মত খাড়া চড়াই ভাঙ্গিয়া সেলুলারের প্রকাণ্ড ফটকে আসিয়া ধন্না দিলাম। ফটকের দুই ধারে আপিস ও গুদাম, ভিতর-ফটক বাহির-ফটক পার হইয়া এই অদ্ভুত বেগশালার অন্তঃপুরে ঢুকিতে দ্বারী (gate-keeper) গুণতি করিয়া খাতায় আমাদিগকে জমা করিয়া লইল, সেই জমার খরচ লিখিল কিন্তু বার বৎসর পর। আমাদের একেবারে রাম বনবাসের দাখিল, লাভের মধ্যে ভাত রাঁধিয়া দিবার পতিবৎসলা সীতাদেবী ছিলেন না। আর অমন সুবোধ সুশীল ফলধারী লক্ষ্মণ-ভাই-ই বা কোথায়? পক্ক কদলী আহরণ করিয়া আনিবার বানরযূথও নাই। তাহার পর রামচন্দ্রের ছিল বেকার দেশান্তর Simple Deportation, আমাদের জন্য ব্যবস্থা হইল হাড় খাওয়া মাস খাওয়া চামড়া দিয়া ডুগডুগি বাজান—অর্থাৎ কিনা শক্ত কাজ বা Hard labour; সুতরাং বনবাসের ওজনের হিসাবে আমরা রামচন্দ্রের চেয়ে অনেক বড় অবতার! এ কথা যাঁহারা না মানেন, তাঁহাদের—বেশী নহে

—এক সপ্তাহ ব্যারি সাহেবের রাজ্যে ঘানি টানিয়া ছিলকা পিটিয়া আসিতে জোড়হস্তে আমাদের অনুরোধ; এক সপ্তাহেই অবতারের ক্রুশের জ্বালা বেশ টের পাইবেন; দুই বৎসর বাস করিলে আক্কেল দাঁত উঠিতে আরম্ভ করিবে; আর যদি দশ বৎসর থাকিতে পারেন তাহা হইলে গাধা পিটাইয়া যে সত্য সত্যই মানুষ করা যায়, এ বিষয়ে সন্দেহ আর আদৌ থাকিবে না। অন্ততঃ আমি দ্বীপান্তরবাসের মত এমন সাক্ষাৎ জ্ঞানদায়ী আর কিছুই দেখি নাই। সত্য সত্যই, ইহার তুল্য কঠিন পরীক্ষাই যে ভগবানের শরণমঙ্গল রূপ।

গেট পার হইয়া আমরা বাগানের ধারে সাঁরি বাঁধিয়া দাঁড়াইলাম, আর সেইখানে জেলার ব্যারি (Mr. D. Barry) সাহেবের ভাল করিয়া প্রথম দেখা পাওয়া গেল। কালাপাণিতে কয়েদীরা ইহঁাকে যে রকম ভয় করিত, ছাগলে বাঘকে তাহার অর্দ্ধেক ভয় করে কিনা সে বিষয়ে আমার খুব সন্দেহ আছে। ব্যারি সাহেব মোটা মানুষ, পেটটি তাঁহার ghee-fed মাড়োয়াড়ির ভুঁড়িকে লজ্জা দেয়; নাক বোঁচা ও রাঙ্গা, চক্ষু গোল গোল, খোঁচা খোঁচা গোঁফে কতকটা রক্তলোলুপ বাঘের ভাব আছে। তিনি আসিয়া এক লম্বা বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, তাহার সারমর্ম্ম এই রকম—"এই যে পাঁচিল দেখচো এ এত নীচু কেন জান? কারণ এখান থেকে পালান এক রকম অসম্ভব। চারিদিকে এক হাজার মাইল সমুদ্র, বনে কেবল শূয়োর আর বনবেড়াল ছাড়া কোন জানোয়ারই নেই বটে, কিন্তু জংলী আছে, তাদের নাম জর্‌রাওয়ালা; তারা মানুষ দেখবামাত্র বিনা বাক্যব্যয়ে চোখা চোখা তীর দিয়ে সাফ এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়। আমায় দেখতে পাচ্ছ? আমার নাম ডি ব্যারি; সোজা ভালমানুষের কাছে আমি তার পরম হিতকারী, ব্যাঁকার আছে আমি চতুর্গুণ ব্যাঁকা। আমার যদি অবাধ্য হও তা'হলে ভগবান তোমাদের সহায় হউন, আমি তো হবো না সেটা এক রকম স্থির; আর এই পোর্ট ব্লেয়ারের তিন মাইলের মধ্যে ভগবান আসেন না সেটা মনে রেখো।

এই সব লালপাগড়ি দেখচো, এরা হ'ল ওয়ার্ডার; কালো উর্দ্দিধারী ওরা হ'ল পেটি অফিসার (petty officer); এরা যা বল্‌বে তা শুনবে, এরা কোন কষ্ট দিলে আমায় জানাবে, আমি ওদের সাজা দেব।"

তাহার পর আমাদের বেড়ি কাটা হইল, সকলের জন্য জাঙ্গিয়া (half pant), কুর্ত্তা (পিরাণ) ও সাদা কাপড়ের টুপি আসিল। এ আন্দামানী পালায় আবার নূতন করিয়া সেই বেশে সঙ সাজা দরকার, তাহাই হইল; সেই হাঁটু অবধি জাঙ্গিয়া হাতকাটা কুর্ত্তা আর খোট্টাই টুপিতে রূপ খুলিল সর্ব্বাপেক্ষা রোগা সড়ঙ্গে তালপাতার সেপাই আমার বেশী! লজ্জায় মনে হইতে লাগিল, "মা ধরিত্রী, তুমি কি সেই ত্রেতাযুগের অভ্যাস ভুলে গিয়েছ? আর একবার দ্বিধা হও মা, আমাদের এ দগ্ধ মুখ একটু লুকাই। আমি জনকনন্দিনী সীতা নই বটে, কিন্তু আমার লজ্জা যে প্রায় শ্রীরাম-জীবনের মত তেমনি প্রাণান্তক।" মা ত দ্বিধা হইলেন না, আমরা তদবস্থায়ই স্নান করিতে গেলাম; বাকি লজ্জাটুকু যাহা ছিল সেখানে গিয়া তাহা বিসর্জ্জন দিতে হইল। স্নান করিতে আমাদিগকে যে কৌপীন বা ল্যাঙ্গোট দিল তাহাতে লজ্জা নিবারণ কোন রকমেই হয় না। কাপড় ছাড়িতে গিয়া আমাদের দশা হইল কৌরব সভায় অপমানিতা দ্রৌপদীর মত, বুঝিলাম "পড়েছি মগের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।" কি করা যায়? মাথা হেঁট করিয়া কোন রকমে স্নানপর্ব্ব সারিতে হইল; বুঝিলাম এখানে ভদ্রলোক বলিয়া কোন বস্তু নাই, মানুষও বুঝি নাই; আছে কেবল কয়েদী! প্রত্যেককে এক একটি মরচে ধরা লাল লোহার থালা ও বাটি দিল, তাহাতে আবার তেলমাখা; থালা তো সাফ হইলই না, উপরন্তু তেল আর রং মিশিয়া একটা পুরু লাল কাই হাত দু'টাকে বড় প্রেমে আঁকড়িয়া ধরিল। সে বন্ধন আর ছাড়ে না! যাহা হউক হাত ঘাসে মুছিয়া কোন রকমে ভাত খাইতে বসিলাম। খাইতে দিল টিনের কৌটায়

(ডাব্বু) করিয়া এক কৌটা ভাত, অড়হরের ডাল আর দুইখানা রুটি। চার দিন খোট্টাই ধরণে চিঁড়া ও ছোলা সেবা করিবার পর সে যে কি অমৃত বোধ হইল তাহা বলিয়া বুঝান দুষ্কর।

খাওয়া দাওয়া হইয়া গেলে আমাদের পাঁচ নম্বর ব্লকে লইয়া গিয়া মাঝে তিন চার কুঠুরি বাদ দিয়া এক এক জনকে বন্ধ করিল। আমরা রহিলাম উপরতলায় Upper Corridorএ; আমাদের জন্য সে নম্বরটি একেবারে খালি করা হইয়াছিল, যাহাতে সাধারণ কয়েদীর সঙ্গে এ নবাগতদের কোন সম্পর্কই না থাকে। জেলের ওয়ার্ডারদিগের পাহারা প্রত্যহ বদলী হয়; আজ যে পয়লা নম্বর উপর লাইনে পাহারা দিতেছিল, সে হয়ত কাল দুই নম্বর কি পাঁচ নম্বর মাঝের লাইনে দিবে। আমাদের জন্য যে বার জন ওয়ার্ডার পাঁচ নম্বরে আসিল, তাহারা একেবারে সেইখানে আটকা পড়িল, তাহাদের বদলী নাই; পাণিওয়ালা, মেথর কেহই সে নম্বর হইতে বাহিরে পা বাড়াইতে পাইত না। ওয়ার্ডার পেটি অফিসার দেওয়া হইয়াছিল বাছিয়া বাছিয়া সব পাঠান আর একজন বর্ম্মা (Burmese)। তাহারা আমাদের ঘরে পুরিয়া তালা দিল, এবং আমরাও দিব্য আরামে শুইয়া কড়িকাঠ গণনায় মনোনিবেশ করিলাম। অন্তর পুরুষ আপন মনে গাহিতে লাগিল, "মন-দুখ কারে কই সই রে!"

পাঁচ নম্বরে এক এক corridorএ ২৬টা করিয়া cell; সুতরাং তিনটি তলায় সর্ব্বশুদ্ধ ৭৮টি সেল্ বা কুঠুরি। জেলের সব মহল গুলিতে সেলের সংখ্যার অনুপাত আন্দাজ এই রকম;—

ব্লক নম্বর	প্রতি লাইনে সেলের সংখ্যা	মোট সংখ্যা
১	৩৫	১০৫
২	৩৫	১০৫
৩	৫২	১৫৬
৪	২২	৬৬

ব্লক নম্বর	প্রতি লাইনে সেলের সংখ্যা	মোট সংখ্যা
৫	২৬	৭৮
৬	২০	৬০
৭	৪০	১২০

সমস্ত জেলে মোট কুঠুরির সংখ্যা ৬৯০; এ জেলে কয়েদী থাকিবার ব্যারাক নাই, সব গুলিই cell; তাই জেলের নাম সেলুলার জেল।

জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কাপ্তান মারে (Captain Murray) বেলা একটা কি দুইটার সময় আসিয়া একবার বন্ধ দরজার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সকলকে একচোখ দেখিয়া গেলেন। মানুষটি গোঁপ দাড়ী কামান, বেঁটে, নীলচক্ষু, মনে হইল বড় চতুর। মাঝে একবার কামার আসিয়া আমাদিগের গলায় এক একটি গো-ঘণ্টা ঝুলাইয়া দিয়া গেল। অন্যান্য জেলে কয়েদী প্রবেশ করিবামাত্র তাহাদের এক একটি নম্বর হয়, পৈত্রিক নামটা লোপ পাইবার দাখিলে দাঁড়ায়; এখানেও তাই। একটি কাঠের দুই ইঞ্চি চওড়া তিন ইঞ্চি লম্বা ও এক ইঞ্চি মোটা তক্তিতে প্রত্যেক কয়েদীর নম্বর, দফা (Section), সাজার তারিখ ও সাজার বৎসরের সংখ্যা লেখা থাকে। তিন রকম তক্তি আছে, সিধা বা সোজা তক্তি, গোল তক্তি ও তিনকোণা বা ভাগোড়া তক্তি। ৩০২ দফার খুনী আসামী এখানে চারকোণা সিধা তক্তি পায়; ডাকাত বদমায়েস রাজবিদ্রোহী বা দুর্দ্দান্ত খুনে গোল ডিম্বাকার তক্তি পায়; আর যাহারা পোর্ট ব্লেয়ার হইতে পালায়, তাহারা সে কুকর্ম্মের পর ধরা পড়িলে তিনকোণা তক্তি পায়। গলায় একটা লোহার রিং পরাইয়া তাহাতে তক্তি টাঙান থাকে; মান্দ্রাজ জেলে টিনের মেডালের মত নম্বর বুকের উপরে কুর্ত্তার গায়ে আঁটা থাকে, পোর্ট ব্লেয়ারে কিন্তু এই গো-ঘণ্টার দুর্ভোগের ব্যবস্থা। বেলা চারটার সময়ে তালা খুলিয়া আমাদিগকে উঠানে লইয়া গেল, সেখানে শৌচ স্নান সারিয়া আমরা থালা বাটি সাজাইয়া

দিয়া ঘরে গিয়া বন্ধ হইলাম। তাহার পর রাঁধুনীর (ভাণ্ডারী) দল আসিয়া পাতে পাতে ভাত, ডাল, রুটি দিয়া গেল; আমরাও বাহির হইয়া খাইতে বসিলাম। অন্য কয়েদীরা কাজ কর্ম্ম সারিয়া স্নান করিয়া নিজেরা সার বাঁধিয়া বসে, ভাত লয়; আমাদের কিন্তু সে স্বাধীনতা ছিল না। তখন প্রথম বম্ কেস্; আমরাই প্রথম এনার্কিষ্টের দল; এক পাল নূতন বুনো বাঘের মত ভয়ের জিনিস; তাই আমাদের লইয়া এত আট ঘাট বাঁধা, এত তালা চাবি আইন কানুনের পালা! আমরাও তখন তটস্থ, সদা প্রাণ বাঁচাইতে যে কি পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত তাহা কে বোঝে? সে সময়ে আন্দামানে জেল কর্ম্মচারীদিগের ও আমাদিগের এই উভয় পক্ষের অবস্থা অতি অপূর্ব্ব! তাঁহারা আমাদিগকে ভয় ও উৎকণ্ঠার চক্ষে দেখেন, আমরাও সেখানকার রাজকূলকে 'বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যং' ভাবিয়া ঠিক সেই চক্ষে দেখি। আবার জেলকর্ত্তৃপক্ষও তাঁহাদের সে ভয়ের ভাব গোপন করিয়া মান সম্ভ্রম বজায় রাখিতে সদা ব্যতিব্যস্ত; তাই মুখে এত ধমক চমক—বাহিরে এত বেপরোয়া devil-me-care ভাব। আমরাও পেট্রিয়টের মর্য্যাদা বজায় রাখিতে ঠিক অমনি উন্মুখ, তাই সময়ে অসময়ে স্থানে অস্থানে সাহেবের কাছে লম্বা চওড়া বক্তৃতা করিতে বেশ একটা আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করিতাম। জেলার হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট খাট পেয়াদাটি অবধি আমাদিগকে কথায় কথায় আইন শুনায়, চোখ রাঙায় এবং অল্পবিস্তর তাড়া করিয়া আসে,—সেটা কিন্তু নিতান্তই প্রাণের দায়ে; কারণ তাহারা ভাবে, "বেটারা যে দুর্দ্দান্ত ও পাজী, যদি কোন অনর্থ ঘটাইয়া বসে।" আমরাও ক্ষণে চক্ষু রক্তবর্ণ করি, আবার পরক্ষণেই আইনের উদ্যতদণ্ড রুদ্র রূপের তাড়নায় নিতান্ত নিরীহ ভাব ধরি; সে সকলও একান্তই গত্যন্তর অভাবে; কি জানি এ মগের মুলুকে প্রাণ বাঁচাইতেই যেরূপ প্রাণান্ত, তাহাতে ফোঁস ছাড়িয়া দিলে যে কর্ত্তব্য স্থির করা এক রকম অসম্ভব হইবে।

পর দিন প্রাতে বাহির হইয়া মুখ হাত ধুইয়া প্রথম গঞ্জির দর্শন লাভ ঘটিল। গঞ্জি বা কাঞ্জি মানে জলে চাউল গলাইয়া ফেনে-ভাতে—এ এক প্রকার rice porridge। নারিকেল মালার আধখানায় বেতের হাতল লাগাইয়া হাতা তৈয়ার হয়, তাহার নাম ডাব্বু। এই ডাব্বুর এক এক ডাব্বু গঞ্জি আমাদের সকলকে দিয়া গেল। তাহাতে না আছে লবণ, না আছে কোন আস্বাদ। প্রত্যেক কয়েদীর জন্য নিত্য ১ ড্রাম লবণ বরাদ্দ আছে; তাহা ডালে ও তরকারীতে দেওয়া হয়; গঞ্জির জন্য লবণের বরাদ্দ নাই। বিস্বাদ হইলেও তাহাই অগত্যা পরম ধৈর্য্যের সহিত গিলিতে হইল। আলিপুর জেলে ইহার নাম লপ্সি, কিন্তু তাহাতে আস্বাদ আছে; কারণ তাহা কথন গুড় দিয়া এবং কথন বা ডালের সহিত খিচুড়ির মত তৈয়ার করা হয়। আমাদিগকে সাত দিন কোরায়ণ্টাইনে বন্ধ রাখা হইয়াছিল। তাহার পর হাসপাতালে নূতন চালানের ডাক্তারী-হিসাবে পরীক্ষার পালা—medical inspection আসিল; এইখানেই নবাগত কয়েদীর প্রথম ভাগ্যনির্ণয়। মারে সাহেব পরীক্ষা করিয়া প্রত্যেকের টিকিটে (Jail History Sheet) লিখিয়া দিলেন, যে, কে কে কঠিন বা হালকা কাজের লায়েক বা উপযোগী। ডাক্তার সাহেবের "Good Physique, fit for hard labour" বা Poor Physique, fit for light labour" এই সব মন্তব্য দেখিয়া পরে জেলার ব্যারী সাহেব কাহার কি কাজ তাহা ধার্য্য করিয়া দেন। পরীক্ষা ও কাজ ধার্য্য না হওয়া অবধি সাত আট দিন আমরা নারিকেল কাতার দড়ি পাকাইয়াছিলাম।

জেলখানার এক দল কয়েদী নারিকেল ছোবড়া জলে ভিজাইয়া কুটিয়া তাহা হইতে আঁশ বাহির করে, এই আঁশ বা তার হইতে অন্য light labourএর দলকে দড়ি পাকাইতে হয়।

নারিকেল আঁশ দিয়া তিন পাউণ্ড রসি বা দড়ি পাকাইয়া দিতে হইবে, এই গেল রসিওয়ালার কাজ।

দড়ি পাকান নারিকেলের খোসা পেটান এ সব কাজ আমরা তো কখন করি নাই, আমাদের উর্দ্ধতন চৌদ্দ পুরুষের মধ্যে যে কেহ কখন ইহার নাম পর্য্যন্ত শোনেন নাই, সে কথা এক রকম নির্ভয়ে একবুক গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া বলা যায়। প্রথম দিনটা সবাইকে দড়ি পাকাইতে হইল। আমাদের প্রত্যেকের ঘরের বন্ধ দরজার কাছে এক এক আঁটি ছিলকা বা নারিকেল ছোবড়ার তার ফেলিয়া দিয়া গেল, বলিয়া গেল, "রস্‌সি বাটো"; অর্থাৎ কি না 'যা পায় তাই খায়' সেইরূপ শান্ত সুবোধ ছেলের মত দড়ি পাকাও। সেগুলাকে খুলিয়া লইয়া তো নাড়িয়া চাড়িয়া যে যাহার মাথায় হাত দিয়া বসিলাম। ইহার দড়ি! তাও কি হয়? সেই যে চার জন ওয়ার্ডার ছিল তাহারা প্রাইভেট টিউটার হইয়া আসিল এই কুকার্য্য শিখাইতে। অল্প অল্প তার লইয়া দুই হাতে মাটিতে ঘসিয়া পলিতা পাকাইতে দেখাইয়া দিল। পলিতা যখন স্তূপাকারে জমা হইয়া উঠিল, তখন সেই গাদা পাশে রাখিয়া দু'হাতে দু'খানা পলিতা ধরিয়া তাহার এক কোণ পায়ের বুড়া আঙ্গুলে মাটিতে চাপিয়া হাতের ঘর্ষণে পাক দিতে হয়, পলিতা পাকাইয়া গিয়া দড়ি হইয়া ফুরাইয়া আসিলে আবার নূতন পলিতা তাহার মুখে জুড়িয়া —দে পাক দে পাক! যতই দড়ি লম্বা হইয়া চলে, তাহাকে পিছনে টানিয়া ফেলিয়া শেষ মুখটা পায়ের তলায় রাখিয়া আবার পলিতা জুড়িয়া পাকাইয়া যাওয়া, এই হইল ব্যাপারখানা। বলিয়া তো এক রকম বুঝাইলাম; করা যে প্রথম প্রথম কি পর্য্যন্ত অসাধ্যসাধন তাহা কেবল ভুক্তভোগীই জানে। অনভ্যাসের কোঁটা কপাল চড়চড় করে, আমাদেরও সেই দশা। ছ্যাকড়া গাড়ীর বেতো ঘোড়ার পায়ের মত দড়ি কোথায়ও মোটা কোথায়ও সরু আর সর্ব্বাঙ্গে শোঁয়া পোকার মত লোমশ এক অদ্ভুত শ্রী ধারণ করিতে লাগিল। সে দড়ি দেখিয়া সরকার বাহাদুর দূরে থাক আমরাই হাসিয়া খুন আর কি!

পরে দেখিয়াছি অভ্যাস একবার হইয়া গেলে হাত কলের মত চলে, আর সর্ সর্ সর্ সর্ করিয়া পাতলা মোলায়েম দড়ি বাহির হইয়া পিছনে গাদা হইতে থাকে। অভ্যাসে যে কাজ এত সুখকর ও সহজ, অনভ্যাসে তাহারই দুঃখ বিরক্তি যে কি রকম তাহা বলিয়া বুঝান দুষ্কর। সে দিন কাহারও দড়ি হইল দশ হাত, কাহারও বা পাঁচ হাত, কাহার বা আধ পোয়া; কেবল উপেন গৃহিনীদের বেণীর মত একটি দেড় দু' হাতের মোটা বিউনি পাকাইয়াছিল। সে দিন উপেনের উপর আর কেহ যায় নাই! কারীগারীর এমন সহজাত জ্ঞান সচরাচর দেখা যায় না!! আমি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দড়ি পাকাইয়াছিলাম বলিয়া কি না উপেন বলিল, "তবে তুমি ঘরে লুকিয়ে পাকাতে।" যেন আমি—ঘোষবংশ মহাবংশের এহেন আমি একটা ডোম টোম আর কি! কথাটার ভঙ্গি দেখিয়া বড়ই চটিয়া গিয়াছিলাম। কি করি শ্রীঘর যে! দাঁত বাহির করিয়া সে কিল চুরি করিতেই হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পাঁচ নম্বরে খোয়েদাদী আমল।

আমরা দশ জনে প্রায় ছয় মাস কাল পাঁচ নম্বরে একত্র থাকি! সাত দিন কোয়ারাণ্টাইনে আটক থাকিবার পর আমাদের সহিত একদল মান্দ্রাজীকে আনিয়া এখানে বন্ধ করা হয়। ইহারা ছয় মাস জেল-বন্ধ ছিল; ইহারাও অন্যত্র গতাগতি-রহিত-দশায় আমাদেরই সহিত পাঁচ নম্বরে থাকিয়া দড়ি তৈয়ার করিত! তাহার মধ্যে নাগাপ্পা ও চিনাপ্পা আমাদিগের বিশেষ বন্ধু ছিল; নাগাপ্পা ছিল জাতিতে ও পেশায় নরসুন্দর; চিনাপ্পা এই মাদ্রাজী দলে বয়সে কনিষ্ঠ ও বড় সৎস্বভাবের ছেলে ছিল। তাহাকে আমরা সকলে বড় ভাল বাসিতাম। ইহারা সকলে মিলিয়া আমাদের দড়ি পাকান-রূপ দুঃসাধ্যসাধনটা সহজ করিয়া দিত। চিনাপ্পা এখন টিকিট পাইয়া স্বাধীন ও উপার্জ্জনক্ষম (Self Supporter) হইয়াছে,—সেলুলার জেলের দেশী ডাক্তারের (Hospital Assistant) বাড়ীতে চাকুরী করে। নাগাপ্পা আর ইহ জগতে নাই।

এই মাদ্রাজী দল জেল হইতে মুক্তি পাইয়া বাহিরে settlementএ যাইতে না যাইতে আর এক দল ১২১ দফার বর্ম্মা চালান পাঁচ নম্বরে আসিয়া পড়ে। ১২১ দফার (section) অপরাধ রাজদ্রোহ। বর্ম্মাদের মৌলবী বা পুরোহিতের নাম ফুঙ্গী; ব্রহ্মদেশে এই ফুঙ্গীরা প্রায়ই এক একটা জাল রাজা (থিবো) খাড়া করিয়া লোক ক্ষেপাইয়া পুলিশ থানার উপর আক্রমণ করাইয়া থাকে। এই বর্ম্মাদলকেও আমাদের অসূর্য্যম্পশ্যা সঙ্গী করিয়া পাঁচ নম্বরে ন যযৌ ন স্থৌ দশায় রাখা হইল। আমাদের অদৃষ্টে সেই প্রথম

দাড়িগোঁফহীন উল্কিপরা কটা কটা বর্ম্মা দর্শন। তাহাদের মধ্যে এক আধ জন হিন্দি জানিত; এবার দড়ি পাকানর আমরাই গুরু, ইহারা চেলা। ইহাদের অনেকে ছিল্কা কুটিত। আমরা এই দড়ি ও ছিলকা শাস্ত্রে অজ্ঞ আনাড়ির দলকে পাইয়া বেশ এক চোট মোড়লীর ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিয়া লইলাম। অনন্যোপায় সহজে কৃতজ্ঞ তাহারাও আমাদিগের পরম ভক্ত হইয়া পড়িল। মাদ্রাজীদের "আইয়া স্বামী" ইঙ্গে য়া" রুণ্ডু রুণ্ডু পো" প্রভৃতি শ্রুতিমধুর কড় মড় শব্দ এক রকম সহিয়া গিয়াছিল; এখন আবার বর্ম্মাদের এই অভিনব আনুনাসিক ভাষায় তো আমরা অবাক্। দুই চারটা যাহা না হইলে চলে না, এমন আটপৌরে বুলি মুখস্থ করিয়া ব্রহ্ম ভাষায় Jack হইতে আমাদের আবার কিছু সময় লাগিল।

এই রকমে প্রায় ছয় মাস কাটিবার পর ক্যাপ্টেন মারে দুই বৎসরের ছুটী লইয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। শুনিলাম, তিনি তাঁহার গৃহলক্ষ্মীশূন্য আলয়ের জন্য একটি লক্ষ্মীর সন্ধানে স্বদেশে যাইতেছেন। তিনি থাকিতে আমাদের অনেক সুখ ছিল; ছিলকার অধিক শক্ত কাজ কখন পাই নাই; তিনি হাসিয়া মিষ্টালাপ করিলে এই নিঃস্বহায় স্বজনহীন জীবন কতকটা বহনীয় হইত; ব্যারি সাহেবের দাপট তাঁহার শাসনে প্রায় মৌখিক ধমক মাত্রে পর্য্যবেসিত ছিল। তবে দুঃখ যাহা হইয়াছিল, তাহা নিতান্তই অদৃষ্ট বশে; তাহার জন্য কোন ব্যক্তি বিশেষ দায়ী না হইয়া অধুনাতন জেলবিধিই প্রকৃতপক্ষে দায়ী, আর দায়ী পোড়া বিধি। জেলার সাহেবের হুকুম ছিল, গোলাওয়ালা কয়েদীরা পরস্পর আলাপ না করে; সেই জন্য উঠিতে বসিতে খাইতে পরিতে আমাদিগকে যথাসাধ্য পৃথক রাখা হইত। পাঁচ নম্বররূপ একটা সঙ্কীর্ণ বটপত্রের উপর দশ জনকে একত্র রাখিয়া আবার পৃথক রাখা যে কি পর্য্যন্ত অসাধ্যসাধন, তাহা সহজেই অনুমেয়। তবে এ হেন দুঃসাধ্যসাধক এক পেটি অফিসার জুটিয়া ছিল, সে জাতিতে

পাঠান, নাম খোয়েদাদ্ খাঁ। আমরা দশ জনেই হিন্দু; হিন্দু পেটি অফিসার ও ওয়ার্ডার সহানুভূতি দেখাইতে পারে, এই ভয়ে আমাদের সব কয়টি ভাগ্যবিধাতা পেটি অফিসার ও ওয়ার্ডার ছিল হিন্দুস্থানী মুসলমান, পাঞ্জাবী মুসলমান এবং পাঠান। পাঠান মানে সহজ কথায় মেওয়াবেচা কাবুলী-ওয়ালা। পোর্ট ব্লেয়ারে ইহারা যমের দোসর; ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনে। নিজেরা যেমন অলস কর্ম্মভীরু ও কলুষিতচরিত্র, তেমনি পরকে খাটাইতে ওস্তাদ ও দুর্দ্দান্ত।

পাঠানের মধ্যে আবার খোয়েদাদ খাঁ পাঠানের রাজা; চেহারাটি বড় হৃদ্‌রোগজনক,—বেঁটে, লোমশ, ঘাড়ে গর্দ্দানে, কালো চাঁপ দাড়ী, বড় বড় বাঁকা দাঁত, ভ্রূ জোড়া, উচ্চ নাশা, মেজাজ তিরিখ্‌খি হাতে লগুড়। এত গুণ দিয়াও বিধি ক্ষান্ত হয়েন নাই; খোয়েদাদকে আবার অসম্ভব রকম কানুনী অর্থাৎ বিধি নিষেধের পক্ষপাতী করিয়াছেন! তাহার রাজ্যে জোড়া বিনা একা চলিবার উপায় একেবারেই নাই, জোড়া ছাড়িয়া অনবধানতায় এক পা পিছালেই তীব্রদৃষ্টি খাঁ সাহেব উদ্যত-লগুড়, তখন কাজেই দন্ত বাহির করিয়া বিনয়নম্র সোহাগে "হাঁ জী, জমাদারজী কসুর হো গিয়া" বলিয়া যথাসাধ্য ক্ষিপ্রতার সহিত সেই ক্ষণিক পরিণয়ের সাথীটিকে আঁকড়িয়া ধরা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকিত না। অন্য নম্বরে জেলে জেলার বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিলে এবং সান্ধ্য প্যারেডের সময়েও জোড়া হইতে হয়, খোয়েদাদের মগের মুলুক পাঁচ নম্বরে কিন্তু দিবারাত্র যুগলে যুগলে বিচরণ।

শুধু জোড়া জোড়ার বিধি হইলে ত বাঁচিতাম, উপসর্গ শুধু ঐখানে শেষ হয় নাই। সারে সারে জোড়া জোড়া ফাইলে গিয়া "খাড়া হো যাও" রবে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে শ্রীরাধার মত থমকিয়া দাঁড়াইতে হইবে, "কাপড়া উতারো" রবে কাপড় ছাড়িয়া লেংট পরিতে হইবে, "পানি লেও" রবে বাটীতে করিয়া

ঝপ্ ঝপ্ মাথায় জল দিতে হইবে। এই ত গেল স্নান পর্ব্ব। শৌচ পর্ব্বও তদ্বৎ—সারবন্দী দশায় জোড়া জোড়া পাইখানামুখো হইয়া বসা, আর হুকুমে হুকুমে এক একবার আট দশ জন করিয়া যাওয়া ; যতক্ষণ না আদেশ হয় ততক্ষণ সংযম অভ্যাস করা। আবার সব চেয়ে ফ্যাসাদ সান্ধ্য প্যারেডে। প্রথম তো জোড়া জোড়া বসা ; প্রতি দুই জোড়া গোলাওয়ালার মাঝে দু'তিন জোড়া বর্ম্মা বা মাদ্রাজী জোড়ার আড়াল চাই ; যাহার সহিত জোড়া বাঁধিব সেও মাদ্রাজী বা বর্ম্মা হওয়া চাই। আমরা এই নিয়মে একবার বসিতে পাইলে নববধূর মত লাজরুদ্ধ অনুচ্চ সরে খাঁ সাহেবের দৃষ্টি এড়াইয়া গল্প করিতাম, সুখের মধ্যে কোন অফিসার উপস্থিত না থাকিলে খাঁ সাহেব তাহা দেখিয়াও দেখিতেন না।

ব্যারি সাহেব আফিস হইতে জেলের দিকে যাত্রা করিবামাত্র সর্ব্বত্র সাড়া পড়িয়া যাইত ; কয়েদীরা সকলে সন্ত্রস্ত সচকিত অবস্থায় যে যাহার স্থানে নিতান্ত সুবোধ সুশীল সাজিয়া বসিত, ওয়ার্ডার বা পেটি অফিসারও কাঠের মত নিশ্চল-ভাবে খাড়া থাকিয়া সেলামের জন্য হাত তৈয়ার রাখিত। ব্যারি সাহেব জেল বন্ধ করিতে আসিয়া গুমটিতে (Central Tower) একবার ঘুরিতেন ; যখন যে নম্বরের সামনে আসা, অমনি 'সরকার' রব, আর কয়েদীর পাল স্প্রীংএর পুতুলের মত এক সঙ্গে তড়াক্ করিয়া খাড়া হইয়া উঠা, সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্ডার পেটি অফিসারের মিলিটারী দস্তুরে সেলাম ! সে এক জার্ম্মণ কাইজারী ব্যাপার !! যদি সকলে ঠিক এক সঙ্গে উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে তো সে দিনকার মত রক্ষা ; "বৈঠ যাও" এই হুকুম পাইয়া সকলে নিরাপদে বসিয়া পড়িলাম। কিন্তু যদি এক জন কি দু'জন একটু দেরি করিয়া উঠিল তবে আর রক্ষা নাই, "সরকার," "বৈঠ যাও" ; আবার "সরকার" "বৈঠ যাও" এমনি মুহুর্মুহু উত্থান ও পতন, উত্থান ও পতন, কেবল মূর্চ্ছা হইতে বাকি আর কি ! আমরা কুম্ভকর্ণ বা মহিষাসুরের গর্জ্জন

কখন শুনি নাই, কিন্তু তাহা যেমনি হউক ব্যারি-সাহেবের ক্রুদ্ধ চিৎকারের কাছে তাহা কপোত কপোতীর কূজন মাত্র ; এ বিষয়ে যাঁহার সন্দেহ আছে তাঁহাকে আমার কেবল এইটুকু মাত্র বলিবার আছে, যে, অন্ততঃ একটা পলিটিক্যাল ডাকাতি করিয়া ব্যারি সাহেব সবল সুস্থ থাকিতে থাকিতে একবার পোর্ট ব্লেয়ারে গিয়া সে জীমূতনাদ শুনিয়া আশা উচিত ছিল ; এখন আর তাহা হয় না। সে রবের বিষয় আর কি বলিব, ঋষির কথায় শুধু বলিতে হয়—

"আশ্চর্য্যবৎ কশ্চিদেনং শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেবং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥"

ইহার শ্রোতাও আশ্চর্য্য, এবং শুনিয়াও কেহ এ অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার বুঝিতে পারে না। যদি কেহ ভাবেন আমি ব্যারি সাহেবের নিন্দা করিতেছি, তাহা হইলে বড় ভুল বুঝিবেন। সমস্ত ভারতবর্ষের দুর্দ্দান্ত খুনী ডাকাত জুয়াড়ী বদমায়েস লম্পটের জমায়েৎ ভারতের শত শত জেলে হয়। আবার তাহাদিগের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া অতি দুর্দ্ধর্ষ অপরাধীর দল আসে পোর্ট ব্লেয়ারে ; এরূপ কুকুরের শাসনের জন্য ব্যারি সাহেবরূপ মুগুর যে আবশ্যক, তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। জেলে রাখিয়া কয়েদীকে যদি বর্ত্তমান কারাপদ্ধতির হিসাবে শুধু ভয় আর শাসনের চাপে ভাল রাখিতে হয়, তবে ব্যারি সাহেব রূপ বিষস্য বিষমৌষধম্ বিনা গতি নাই। কিন্তু আমাদের কয়েকটি গরীবের পক্ষে ব্যারি রূপ মুষ্টিযোগ প্রয়োগটা অন্ততঃ আমাদের মতে তো লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইয়াছিল। না হয় বোমাই ফেলিয়াছিলাম, তাহা বলিয়া কি সাক্ষাৎ জীবন্ত কৃতান্তের হাতে সঁপিয়া দিতে হয় ?

ব্যারি তবু তো পদে আছে, সে মুষ্টিযোগের উপর আবার খোয়েদাদী বজ্রযোগ। প্রাণান্ত আর কি! বৈকালে যখন তালাসী বা কাপড় চোপড় ঝাড়িয়া দেখার সময় হয়, তখন তিন বার "ঠন্ ঠন্ ঠন্" "ঠন ঠন্ ঠন্" "ঠন্ ঠন্ ঠন্" করিয়া ঘণ্টা পড়ে ; অন্য নম্বরে কয়েদীরা তৎক্ষণাৎ

"খাড়া হো যাও" রবে দাঁড়াইয়া কাপড় চোপড় খুলিয়া রাখিয়া তালাসি (search) দেয়, আবার "উঠায় লেও" রবে কাপড় তুলিয়া লইয়া পরিয়া "বৈঠ যাও" হুকুম পাইলে বসিয়া যায়। কিন্তু এ অবস্থায় কানুনী খোয়ে-দাদের ব্যবস্থা ইহার উপর আরও সাড়ে ছাপ্পান্ন রকম। প্রথমে "খাড়া হো যাও", তাহার পর "সিধা এক্ লাইন্‌সে খাড়া হো যাও", তাহার পর "কাপ্‌ড়া উতারো", তাহার পর "হাঁত মে রাখো", তাহার পর "কদম্ উঠাও", তাহার পর "রাখ্ দেও"। প্রথম হুকুমে আমরা দাঁড়াইলাম; দ্বিতীয় হুকুমে এ উহার দিকে দেখিতে দেখিতে ঘেঁসাঘেঁসী এক লাইন হইলাম; তৃতীয় হুকুমে কুর্ত্তা ও টুপি খুলিলাম; চতুর্থ হুকুমে তাহা এক হাতে ধরিয়া সম্মুখে হাত লম্বা করিয়া দিলাম, পঞ্চম হুকুমে এক পা তুলিয়া নৃত্যকুশলা বাইওয়ালীর ঢঙে দাঁড়াইলাম, এবং ষষ্ঠ হুকুমে এক পা আগাইয়া গিয়া মাটিতে কাপড় রাখিয়া দিলাম। যদি ঠিক হইল তাহা হইলে খাঁ সাহেব ভাঁঙা বাঁকা দাঁতে দাড়ীর জঙ্গলমহাল আলোকিত করিয়া মহোৎসাহে বলিলেন, "সাবাস্ বাহাদুর!" আমরাও প্রাণের দায়ে তাঁহার কৃপা পাইবার জন্য যে যাহার দু'পাটি দাঁত বাহির করিয়া পুলকহাস্যে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলাম! এমনি সাড়ে ছাপান্ন হুকুমের পর বসিয়া পড়িয়া তিসরা ঘন্টি বা তৃতীয় ঘণ্টার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম; এই ঘণ্টা বাজিলে যে যাহার গোরালে গিয়া উঠিব, তাহা হইলে রাত্রের মত খাঁ সাহেবের মারাত্মক সঙ্গসুখ হইতে প্রাণ রক্ষা হয় আর কি!

দড়ি পাকাইলেও খাঁ সাহেবের মন পাওয়া দায়; হাতে তুলিয়া হয় তো বলিলেন, 'মোটা হ্যায়। সরম্ লাগ্‌তা নেহি?" ছিলকা হাতে লইয়া দাঁত খিঁচাইয়া হয় তো টিপ্পনি হইল, "এই বাঙ্গালী কচ্‌ড়া হ্যায় (অর্থাৎ নোংরা ভুসা ভরা), গিলা শুখাও (জল শুখাও)।" খাঁ সাহেবের মন পাইবার জন্য আমরা না করিতাম এমন কর্ম্মই নাই। খোয়েদাদ ব্যারী সাহেবকে যমের

অধিক ভয় করিত, ব্যারী সাহেব জেলের দিকে আসিতে আরম্ভ করিলে সে বিড় বিড় করিয়া "বিস্‌মিল্লা" নাম জপ করিতে লাগিয়া যাইত। কয়েদীদিগের মধ্যে মোল্লা ও নমাজী বলিয়া তাহার বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। আমরা প্রাণপণে তাহার ধর্ম্মবুদ্ধির প্রশংসা করিতাম, মুসলমান হইবার দুরাকাঙ্ক্ষাও জানাইতাম, খোয়েদাদের উচ্চ হৃদয় ও মানুষ চরাইবার ক্ষমতার তারিফ করিতাম, আর শুনিতে শুনিতে আনন্দে খাঁ সাহেবের প্রায় দশাপ্রাপ্তি ঘটিত। আমি ও অবিনাশ convalescent gangএ ছিলাম, এই কন্‌ভ্যালেসেণ্ট দলে নাম লিখা হইলে মাথা পিছু ১২ আউন্স দুধ পাওয়া যায়। আমি আমার দুধ লুকাইয়া মাঝে মাঝে খাঁ সাহেবকে দিতাম, খাঁ সাহেব তাহা দুই একবার আমতা আমতা করিয়া লইতেন এবং পরম পরিতোষ পূর্ব্বক পান করিয়া দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে দন্ত বাহির করিয়া বলিতেন, "ইয়া বিস্‌মিল্লা ! খোদানে কেয়া আজব্ চিজ্ বনায়া হ্যায়।" বলা বাহুল্য এই দুধটুকু আমার ঘুষ,—এই উষ্ট্রভোজী কাবুলী দুর্ব্বাসার ক্রোধশান্তির কামনায় আমার অর্ঘ্য।

ব্যারী সাহেব যেমন দুর্দ্দান্ত ছিলেন, তেমনি আমাদিগের উপর কৃপা-পরবশও ছিলেন। নিত্য সকালে জেলে রোঁদে ঘুরিবার সময় একবার এবং বৈকালে জেল বন্ধের (Lock up time) সময়েও একবার হেলিতে দুলিতে বর্ম্মাচুরুট ফুঁকিতে ফুঁকিতে লাঠি বগলে আসিয়া জনে জনের সহিত গল্প গুজব করিয়া যাইতেন। তিনিও বুঝিতেন এবং আমরাও বুঝিতাম, যে, এই মেহেরবাণীর ফলে আমাদের উপর পেটি অফিসার ও ওয়ার্ডার দলেরও কতকটা নেকনজর পড়িত। সাহেব গল্প করিরা সমানে সমানে ইয়ারকি দিয়া যায়, তবে বাবুজীরা এক একটা কেও কেটা হবে ! এই খ্যাতির বা prestige থাকায় আমাদিগের উপর কদর্য্য অপমানকর গালি ও প্রহারটা তেমন হয় নাই। সাধারণ কয়েদীর কিন্তু সেটা একচেটে নিত্য অধিকার।

আমরা কয়েদীকে নির্ব্বিবাদে অতখানি গালি ও ধনঞ্জয় পরিপাক করিতে দূর হইতে দেখিয়া ভয়ে কাহিল হইতাম মাত্র; জেলার ও 'সুপর্ডণ্ট' সাহেবের সহিত "পাণিকা মাফিক" হরদম ইংরাজি বলার সম্ভ্রমে আততায়ীদিগের শ্রদ্ধাবনত লগুড়ের আস্বাদন আমাদিগকে সচরাচর বড় একটা করিতে হয় নাই।

ব্যারী সাহেবের মেয়ের নাম ক্যাথ্লিন; স্ত্রী জন্ম খোঁড়া, তাঁর একটা পা স্বভাবতঃ কিছু ছোট। সেলুলার চিঁড়িয়াখানার এই আজগুবি নূতন চিঁড়িয়া গুলিকে দেখাইবার জন্য সাহেব মাঝে মাঝে সস্ত্রীক সকন্যা আসিতেন, আর আমরা সেই খালি পায়ে জাঙ্গিয়াকুর্ত্তাটুপীধরা দশায় গলায় কাঠের গো-ঘণ্টা দোলাইয়া অপূর্ব্ব সঙরূপে মেম সাহেবদের কাছে স্মিতহাস্যে দাঁড়াইতাম। সাহেব বোধ হয় অকপটে ভাবিতেন, যে, সত্য সত্যই বড় কৃপা করিতেছেন; আমরা মরমে মরিয়া যে দুঃসহ লজ্জার কশাঘাত নীরবে নির্ব্বিবাদে সহিয়া দর্শন দিতাম, তাহা বুঝিতাম কেবল ভুক্তভোগী আমরাই। ব্যারী সাহেবকে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতাম না, ভাবিতাম সাহেব কৃপা করিতেছেন করুন, অরসিকে রসের নিবেদনে আর ফল কি?

"কি যাতনা বিষে
বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে
দংশেনি যারে?"

এই সময়ে সেলুলার জেলে কয়েদীর কাজকর্ম্ম বুঝিয়া লইবার মুন্সী ছিল গোলাম রসুল। এই ভবচিঁড়িয়াখানায় সে আর একটি অপূর্ব্ব চীজ্। কালো, রোগা, কদাকার, দীর্ঘদন্ত ও সাহেবের শ্রীচরণের আজ্ঞাবহ ছুঁচো বিশেষ। সেই তখন ওয়ার্ডার হইয়া জেল মুন্সীর কাজ করিতেছে। পারতপক্ষে স্নান রূপ কুকার্য্যটা সে করিত না, তাই গন্ধের জ্বালায় তাহার কাছে দাঁড়ান দুষ্কর হইত। গোলাম রসুল যখন প্রথম জেলে আসে, তখন

াহার এই স্নানের অনভ্যাসের জন্য বড় সাহেব এক দিন হুকুম দেন, যে, তন চার জন মেথর তাহাকে ধরিয়া স্নান করাইবে। হুকুম হইলে আর ক্ষা আছে? কয়েক জনে ধরিয়া তাহাকে হৌদি বা চৌবাচ্চার উপর ফলিয়া নারিকেল ছোবড়া দিয়া রগড়াইয়া নাকি প্রাণ কণ্ঠাগত করিয়া স্নান রাইয়াছিল। কয়েদীদিগের মধ্যে চিরদিন রসুলকে ক্ষেপাইবার এইটি একটি বদ্রূপের বিষয় হইয়া আছে। গোলাম রসুল দাঁত খিঁচাইতে অদ্বিতীয়; উপেনকে এক দিন দড়ি খারাপ হইবার জন্য দাঁত খিঁচাইয়া ধমক দেয়; সে াগ উপেনের আজও যায় নাই। অবশ্য ঠিক তখন যে ভাবটার উদয় ইয়াছিল, তাহা রাগ আর ভয়ের অপূর্ব্ব মণিকাঞ্চন যোগ। এই গোলাম সুল অসংখ্য লোককে শাস্তি দেওয়াইয়াছে; তাহার হাতে বেড়ি াতকড়ি খাইয়া নাস্তানাবুদ হইয়াছে, এমন বহুতর লোক আজ আন্দামানে টাপুতে টাপুতে ওত পাতিয়া আছে; তাহাদের আশা এই যে, একবার কান অপরাধে গোলাম রসুল বরখাস্ত হইয়া জেলের বাহির হইলেই তাহারা তাহাকে দেখিয়া লইবে! কিন্তু ব্যারী সাহেবের প্রিয়তমা চেড়ীদিগের অন্ততম সুল বড় ধূর্ত্ত, তাই সে জেল হইতে বাহির হয় নাই। জেলেই ওয়ার্ডার ইতে ক্রমশঃ পেটি অফিসার, টিণ্ডাল ও পরে বর্ত্তমানে জমাদার হইয়া আজও নির্ব্বিবাদে মোড়ল-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

খোয়েদাদ, গোলাম রসুল ও ব্যারী সাহেব এই ত্র্যহস্পর্শে আমরা শাশুড়ী ও রক্তচক্ষু পতিদেবতা-তাড়িত বধূর মত পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম! এইরূপে পাচ নম্বরে কিঞ্চিদধিক এক বৎসর মারে সাহেবের কৃপায় কাটিল মন্দ নহে। হেমদা' ইন্দু প্রভৃতি কয়েক জনকে ইতিমধ্যে একবার কাস্তে হাতে পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের মাঠে ঘাস কাটিতেও দেওয়া হয়। বোধ হয় বাবু-যাত্রা-নির্ব্বাহকারী নিরীহ পাঠক ভাবিতেছেন,— "ঘাস কাটা! ভদ্র সন্তানের!!" আসলে কিন্তু উল্টারাজার দেশে

ঘাসকাটা, ঝাড়ুদারী, এমন কি মেথরের কাজ পাইলে লোকে সত্য সত্যই বর্ত্তিয়া যায়। কলু টানিবার ভয়ে অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ ছত্রীকে মেথর হইবার আবেদন জানাইতে আমরা দেখিয়াছি। এই সব কাজের লোক যখন তখন যেখানে সেখানে ইচ্ছামত ঘুরিতে পায়; কাজও হালকা, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ত্তব্যটুকু করিয়া লইতে পারিলেই সমস্ত দিন ছুটি। সুতরাং বোমার আসামীদের হাতে কাস্তে দিয়া উঠানে এমন স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দেওয়ায় মারে সাহেব সত্যই আমাদের উপর বড় কৃপাপরবশ হইয়াছিলেন; তাহার উপর আবার মারের হুকুম ছিল যখন রৌদ্র বা বর্ষা থাকিবে না, তখন ঘাস কাটিতে হইবে। সুতরাং রৌদ্র বা বর্ষার সময় উঠানের মাঝে কাঠের কারখানার বারাণ্ডায় পায়ের উপর পা দিয়া দিব্য আরাম ভোগ করা আর কি! যদি বা কখন একটু মেঘের চাপ দশ পনর মিনিটের জন্য সূর্য্যদেবের উপর আসিয়া পড়িল, তবেই ঘাস কাটিবার পালা, নহিলে নয় রৌদ্র, নয় বর্ষা তো লাগিয়াই আছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

উপেনের কথা

ধর্ম্মঘট

কালাপানির জেলে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই আমাদের মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণ, তাহাদের পৈতা কাড়িয়া লওয়া হইল। দেশের জেলে ঐরূপ কোনও নিয়ম না থাকিলেও কালাপানিতে ঐ নিয়মই বলবৎ। জেল জগন্নাথ ক্ষেত্র—এখানে জাতিভেদ মরিয়া প্রায় প্রেতদশা লাভ করিয়াছে। তবে মুসলমানদের দাড়ি বা শিখের চুলে হাত দেওয়া হয় না; কিন্তু গোবেচারা ব্রাহ্মণের পৈতা কাড়িয়া লইতে সবাই ক্ষিপ্রহস্ত। তাহার কারণ শিখ মুসলমান গোঁয়ার, ব্রাহ্মণ নিরীহ। যাই হোক, তেজোহীন ব্রহ্মণ্যের নির্ব্বিষ খোলসখানাকে ত্যাগ করিয়া আমরা ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশিয়া গেলাম। মজার কথা এই কোনও ব্রাহ্মণকেই বিশেষ আপত্তি করিতে দেখিলাম না। এ জগতে যে পড়িয়া মার খায়, তাহাকে মারিবার জন্য সকলের হাত উসখুস করে। অনেক দিন পরে রামরক্ষা নামে একজন পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণ শুধু ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি কারাধ্যক্ষকে বলেন যে পৈতা না থাকিলে পান ভোজন করা তাঁহার ধর্ম্মে নিষিদ্ধ; সুতরাং পৈতা কাড়িয়া লইলে তিনি জেলখানার অন্ন গ্রহণ করিবেন না। তিনি চীন শ্যাম জাপান অনেক ঘুরিয়াছিলেন, জাতিভেদের গোঁড়ামী তাঁহাতে ছিল বলিয়া বোধ হয় না; তবে কর্ত্তব্যবোধে পৈতা হরণের বিরুদ্ধে তিনি এত লড়িয়াছেন। দুর্ব্বলের কথা কে কবে শুনে? পৈতা তাঁহার কাড়িয়া লওয়াই হইল; তিনিও পানাহার

ত্যাগ করিলেন। ৪ দিন নিরম্বু উপবাসের পর তাঁহার নাকে রবারের নল stomach pipe পুরিয়া দিয়া পেটে দুধ ঢালিয়া দেওয়া হইতে লাগিল। মাসাবধি কাল এইরূপ চলে। তখন একটা ধর্ম্মঘটের (strike) দমকা ঝড় বহিতেছিল, সেই উত্তেজনাবশে রামরক্ষা কর্ত্তৃপক্ষের সহিত অনেক বাকবিতণ্ডা লড়াই করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশের জেল হইতে কালাপানিতে আসিবার পূর্ব্বেই নানা কঠোরতায় তাঁহার শরীর ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এইবার যক্ষার লক্ষণ দেখা দিল। অল্প দিন পরে যক্ষারোগের চিকিৎসালয়ে গিয়া তিনি যুগপৎ কারাযন্ত্রণা ও ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হন।

যাক্ সে কথা। মরিয়া বাঁচিবার দুঃসাহস আমাদের কুলাইল না। মরিলাম না ত বটেই; অধিকন্তু জেলখানার খোরাক খাইয়াই বাঁচিয়া থাকিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়া রহিলাম। সেটাও বড় কম বাহাদুরির কথা নয়। রেঙ্গুন চালের ভাত ও মোটা মোটা রুটি, এ না হয় এক রকম চলে; কিন্তু কচুর গোড়া, ডাঁটা ও পাতা; চুপড়ি আলু; খোসাসমেত কাঁচা কলা ও পুঁই শাক; ছোট ছোট কাঁকড় আর ইন্দুরনাদি এক সঙ্গে সিদ্ধ করিয়া যে পরম উপাদেয় ভোজ্য প্রস্তুত হয়, তরকারীর বদলে তাহার ব্যবহার করিতে গেলে চক্ষে জল না আসে, বাঙলা দেশে এমন ভদ্রলোকের ছেলে এ [illegible]র বৎসরেও বড় বিরল। জাহাজে চারি দিন "চানা ও চুড়া" চিবাইতে চিবাইতে গিয়াছিলাম; সুতরাং পেটের জ্বালায় আমরা সে অন্নও বেশ হাসিমুখে গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলাম।

জেলে ঢুকিবার পূর্ব্বেই জেলার সাহেব আমাদের বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে আমাদের পরস্পরের মধ্যে কথাবার্ত্তা কহা বা একত্র বসা নিষিদ্ধ; নিয়মলঙ্ঘনে শাস্তি অনিবার্য্য।

এইবার কাজকর্ম্মের পালা। কালাপানিতে নারিকেল প্রচুর জন্মায়, আর সেগুলি সমস্তই সরকারী সম্পত্তি। সেই জন্য সেখানে প্রধানতঃ নারিকেল

লইয়াই কারবার। নারিকেলের ছোবড়া পিটিয়া তার বাহির করা ও তাহা হইতে দড়ি পাকান, শুষ্ক নারিকেল ও সরিষা ঘাণিতে পিষিয়া তেল বাহির করা, নারিকেলের মালা হইতে হুঁকার খোল প্রস্তুত করা—এই সমস্তই জেলখানার প্রধান কাজ। এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; এ ভিন্ন এখানে বেতের কারখানাও আছে; তাহাতে প্রধানতঃ অল্পবয়স্ক ছেলেরাই কাজ করে।

ঘানি ঘুরান ও ছোবড়া পেটাই সব চেয়ে কঠিন। আমাদের মধ্যে বারীন্দ্র ও অবিনাশ নিতান্ত দুর্ব্বল ও রুগ্ন বলিয়া তাহাদিগকে দড়ি পাকাইতে দেওয়া হইল; অপর সকলের ভাগ্যে ছোবড়া পেটা মিলিল। সকাল বেলা উঠিয়া শৌচকর্ম্মের কিঞ্চিৎ পরেই সকলে অন্ন বা "কঞ্জি" গলাধঃকরণ করিয়া "ল্যাঙ্গোটি" আঁটিয়া ছোবড়া পিটিতে বসিয়া যাইতে হয়। প্রত্যেককে বিশটী নারিকেলের শুষ্ক ছোবড়া দেওয়া হয়। বর্ণনাটি আর একবার দিই। একখণ্ড কাঠের উপর এক একটি ছোবড়া রাখিয়া একটী কাঠের মুগুর দিয়া তাহা পিটিতে পিটিতে ছোবড়াটী নরম হইয়া আসে। ছোবড়াগুলি পিটিয়া নরম হইলে তাহাদের উপরকার খোসা উঠাইয়া ফেলিতে হয়। তাহার পর সেইগুলি জলে ভিজাইয়া পুনরায় পিটিতে হয়। পিটিতে পিটিতে ভিতরকার ভুসি ঝরিয়া গিয়া কেবলমাত্র তারগুলিই অবশিষ্ট থাকে। এই তারগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া পরিষ্কার করিয়া প্রত্যহ এক সেরের একটী গোছা প্রস্তুত করিতে হয়।

প্রথম দিন এই ছোবড়া পেটা ব্যাপারটা হাঁ করিয়া বুঝিতেই আমাদের অনেকক্ষণ গেল; তাহার পর পিটিতে গিয়া দেখিলাম হাতময় ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছে। সমস্ত দিন মাথা খুঁড়িয়া কোনও রকমে আধ পোয়া তার প্রস্তুত করিলাম। অষ্টমীর পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে যথন বেলা তিনটার সময় কাজ দাখিল করিতে হাজির হইলাম, তখন দাঁত খিচুনির বহর দেখিয়াই চক্ষু স্থির হইয়া গেল। গালাগালিটা নির্ব্বিবাদে হজম করিবার সু-অভ্যাস

কস্মিনকালেও ছিল না; আজ বিদেশে এই শত্রুপুরীর মধ্যে কঠোর পরিশ্রম ও গালাগালি সম্বল করিয়া দীর্ঘজীবন কাটাইতে হইবে ভাবিয়া যেন প্রাণটা হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল। আর সে গালাগালির বা কি বাহার! শরৎবাবুর কি একখানা বইএ পড়িয়াছিলাম যে গালাগালিতে হিন্দুস্থানীর মত লম্বা জিহ্বা আর কোনও জাতির নাই। তাঁহাকে একবার পোর্ট ব্লেয়ারে গিয়া ভাষাতত্ত্বের অনুশীলন করিতে আমাদের সবিনয় অনুরোধ। হিন্দুস্থানীর সহিত পাঞ্জাবী পাঠান ও বেলুচ মিশিয়া যে অমৃতের উৎস সেখানে খুলিয়া দিয়াছে, তাহার আস্বাদন একবার যাহার অদৃষ্টে ঘটিয়াছে, সেই মজিয়াছে। সাত জন্ম সে ভাষা চর্চ্চা করিলেও আমাদের দেশের হাড়ী বাগদী পর্য্যন্ত সে রসে সম্যক অধিকারী হইতে পারিবে কি না সন্দেহ। বীভৎসতার মধ্যে এত রকমারি থাকিতে পারে, পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না।

থাক সে কথা। ছোবড়া পিটিয়া, কচু পাতার তরকারী ও গালাগালি খাইয়া পাঁচ নম্বরে এক রকমে ত দিনগত পাপক্ষয় করিতে লাগিলাম; কিন্তু উপদেবতাদের দৌরাত্মে ক্রমে জীবন প্রায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল। দেশের জেলে যেমন মেট ও কালাপাগড়ী, কালাপানিতে সেইরূপ warder, Petty Officer, Tindal ও জমাদার। সাধারণ কয়েদীই ৫।৭ বৎসর সাজা কাটিবার পর এই সব পদে উন্নীত হয়; কিন্তু কালাপানিতে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহুবিধ কর্ম্মের ভার ও কর্ত্তৃত্ব ইহাদের উপর ন্যস্ত। যমরাজ কারাধ্যক্ষের ইহারাই প্রহরী। ছেলেবেলা এক জন সুরসিক বাঙ্গালী বক্তার মুখে শুনিয়াছিলাম যে যিনি "আষ্টে পিষ্টে" মারেন তিনিই "মাষ্টার"; আমারও সেইরূপ মনে মনে একটা বেশ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে "প্রহার" শব্দের সহিত "প্রহরী" শব্দের নিশ্চয় একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। গালাগালি ও মারাপটে ইহারা সকলেই সিদ্ধহস্ত। "রামলাল ফাইলে টেড়া হইয়া বসিয়াছে, দাও উহার ঘাড়ে দুইটা রদ্দা; মুস্তাফা আওয়াজ দিবামাত্র খাড়া হয় নাই, অতএব উহার

গোঁফ ছিঁড়িয়া লও; বকাউল্লার পাইখানা হইতে ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছে, অতএব তিন ডাঙা লাগাইয়া উহার পশ্চাদ্দেশ ঢিলা করিয়া দাও।” এইরূপে বহুবিধ সদ্যুক্তি প্রয়োগে তাঁহারা জেলখানার শান্তি (discipline) রক্ষা করেন।

কয়েদীরা অনেক সময় গলার মধ্যে গর্ত্ত করিয়া পয়সা কড়ি লুকাইয়া রাখে; নানারূপে অত্যাচার করিয়া কয়েদীর নিকট হইতে সেই পয়সার ভাগ আদায় করাই প্রহরীদের প্রধান উদ্দেশ্য। আমাদের ত পয়সা কড়ি নাই, আমরা যাই কোথায়? বারীন্দ্র নিতান্ত জীর্ণশীর্ণ বলিয়া হাঁসপাতাল হইতে তাঁহার প্রত্যহ ১২ আউন্স দুধ পাইবার ব্যবস্থা ছিল। আমাদের Petty Officer খোয়েদাদ মিঞার মুখে সেই দুধটুকু ঢালিয়া দিয়া তবে তিনি অত্যাচারের হাত হইতে নিস্তার পাইতেন। খোয়েদাদ এক জন প্রচণ্ড নমাজী মোল্লা; পুরাদস্তুর “খোদাকা বান্দা”। তিনি তাঁহার গোঁফছাঁটা মুখখানির মধ্যে দুধটুকু ঢালিয়া দিতে দিতে বলিতেন—“ইয়াঃ বিস্‌মিল্লা! খোদানে কেয়া আজব্ চিজ পয়দা কিয়া!”

আরও বিপদের কথা এই, এ সকল অত্যাচারের প্রতীকার নাই। প্রহরীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য সাবুদ দিয়া কে আপনার ঘাড়ে ভূত ডাকিয়া আনিবে? আর মোকর্দ্দমা প্রমাণ করিতে না পারিলে মিথ্যা মোকর্দ্দমার জন্য উল্টা সাজা খাইবার ভয়ও যথেষ্ট! রক্ষকই যেখানে ভক্ষক, সেখানে প্রাণ বাঁচে কিরূপে?

এইরূপে ছয় সাত মাস যাইতে না যাইতে নাসিক, খুলনা ও এলাহাবাদ হইতে ১০।১২ জন রাজনৈতিক কয়েদী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বসমেত আমাদের সংখ্যা হইল প্রায় ২০।২২ জন।

এই সময় আমাদের ভাগ্যগগনে নূতন জেল সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টরূপী এক ধূমকেতুর উদয় হইল। আমাদের কপাল এইবার পূরাপুরি ভাঙ্গিল। তিনি

আসিবার কিছু দিন পরেই আমাদের জনকতককে ঘানিতে দিয়া তেল পিষাই-বার ব্যবস্থা করিলেন। উল্লাসকরকে যে সরিষা পিষিবার ঘানিতে জোড়া হইল তাহা অনেকটা আমাদের কলুর বাড়ীর দেশী ঘানির মত ; আর হেমচন্দ্র, সুধীর, ইন্দু প্রভৃতি বাকি কয়জনকে যে ঘানিতে পাঠান হইল তাহা হাত দিয়া ঘুরাইতে হয়। প্রত্যহ এক একজনকে ১০ পাউণ্ড সরিষার তেল বা ৩০ পাউণ্ড নারিকেল তেল পিষিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। মোটা মোটা পালোয়ান লোকও ঘানি ঘুরাইতে হিমসিম খাইয়া যায় ; আর আমাদের যে কি দশা হইল তাহা মুখে অবর্ণনীয়। জেলের যে অংশে তেল পেষা হয় দুই জন পাঠান পেটী অফিসার তখন সেখানকার হর্ত্তাকর্ত্তা। সেখানে ঢুকিতেই তাঁহাদের মধ্যে এক জন তাঁহার বদ্ধমুষ্টি আমাদের নাকের উপর রাখিয়া বেশ জোর গলায় বুঝাইয়া দিল যে কাজকর্ম্ম ঠিক ঠিক না করিতে পারিলে তিনি আমাদের নাকগুলি ঘুঁসার চোটে থ্যাবড়া করিয়া দিবেন। কিন্তু নাকের ভবিষ্যৎ দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া সময় নষ্ট করিবার উপায় নাই। তাড়াতাড়ি কাঁধের উপর ৫০ পাউণ্ড নারিকেলের বস্তা ও হাতে একটা বালতি লইয়া তেতলায় চড়িয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। আর সে ত কাজ নয় ; রীতিমত মল্লযুদ্ধ। ৮।১০ মিনিটের মধ্যেই দম চড়িয়া জিভ শুকাইতে আরম্ভ হইল। এক ঘণ্টার মধ্যেই গা হাত পা যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। রাগের চোটে মনে মনে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম, কিন্তু সে নিষ্ফল আক্রোশ। একবার মনে হইল ডাক ছাড়িয়া কাঁদিলে বুঝি এ জ্বালা মিটিবে, কিন্তু লজ্জায় তাহাও পারিলাম না। ১০টার ঘণ্টার পর যখন আহার করিতে নীচে নামিলাম, তখন হাতে ফোস্কা পড়িয়াছে, চোখে সরিষার ফুল ফুটিতেছে আর কাণে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকিতেছে। প্রথমেই দেখিলাম বৃদ্ধ হেমচন্দ্র এক কোণে চুপ চাপ বসিয়া আছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—"দাদা, কি রকম ?" দাদা হাত দুখানা দেখাইয়া

বলিলেন—"দারুভূতো মুরারি"। কিন্তু হাত দু'খানা আড়ষ্ট হইয়া দারুময়ই হোক, আর পাষাণময়ই হোক তাঁহার মনের জোর কখন এক বিন্দু কমিতে দেখি নাই। দুঃখকষ্ট হাসিমুখে সহ্য করিতে, তীব্র যন্ত্রণার মাঝখানে অবিচলিতভাবে ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য স্থির করিতে হেমচন্দ্র একরূপ অদ্বিতীয়। হেমচন্দ্রকে আত্মহারা হইতে কেহ বড় একটা দেখে নাই। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া যখন কেহ কেহ যা হউক কিছু একটা করিয়া ফেলিবার সংকল্প করিয়াছে, তখন হেমচন্দ্রই আপনার মনের বল তাহাদের মধ্যে সংক্রামিত করিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়াছেন।

আমাদের মধ্যে ২।৩ জন ব্যতীত স্বহস্তে ৩০ পাউণ্ড তেল পেষা সকলেরই সাধ্যাতীত। অনেক সময় অন্যান্য কয়েদীরা লুকাইয়া আমাদের সাহায্য করিত।

এইরূপে দিনের বেলা ঘানি ঘুরাইয়া ও রাত্রে আধ-মরার মত পড়িয়া থাকিয়া ত এক মাস কাটিল।

এক মাস পরে প্রথম দল বদলি হইয়া দ্বিতীয় দল ঘানি পিষিতে আসিল। অবিনাশ নিতান্ত দুর্ব্বল ও তাহার Tuberculosis হইবার সম্ভাবনা জানিয়া প্রথম বারের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহাকে কঠিন কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয় বারের কর্ত্তা মেজর বার্কার তাঁহাকে বিনা পরীক্ষায় ঘানি পিষিতে পাঠাইলেন। এলাহাবাদের "স্বরাজ" সম্পাদক শ্রীমান নন্দগোপালকেও এই সঙ্গে ঘানিতে আনিলেন।

নন্দগোপাল পাঞ্জাবী ক্ষত্রিয়। দীর্ঘকায় সুপুরুষ, ১২১ ক ধারায় অভিযুক্ত হইয়া ১০ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরিত হন। তিনি ঘানিতে যাইয়া এক নূতন কাণ্ড করিয়া বসিলেন। প্রথমেই বলিলেন "অত জোরে ঘানি ঘুরান আমার পোষাইবে না।" ঘানি সাধ্যমত আস্তে আস্তে ঘুরিতে লাগিল; ফলে ১০টার মধ্যে তেলের এক তৃতীয়াংশও পেষা হইল না। ১০টার সময় নীচে আসিয়া

সাধারণ কয়েদীরা ৫।৭ মিনিটের মধ্যেই তাড়াতাড়ি ভাত খাইয়া লইয়া আবার কাজ করিতে ছুটে। ১০টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত আইন অনুসারে আহার ও বিশ্রামের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও কাজ পাছে শেষ না হয় এই ভয়ে তাহারা বিশ্রাম লইতে সাহস করে না। কাজ শীঘ্র শেষ হইলে হাত পা ছড়াইয়া একটু জিরাইতেও পায়। নন্দগোপালের সে ভয় নাই। পেটি অফিসার আসিয়া তাড়াতাড়ি খাইয়া লইবার জন্য তাঁহার উপর হুকুম জারি করিল। নন্দগোপাল তাহাকে স্মিতবদনে স্বাস্থ্যনীতি বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, যে, তাড়াতাড়ি আহার করিলে পাকস্থলীর বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা ; আর ১০ বৎসর যখন তাঁহাকে সরকার বাহাদুরের অতিথি হইয়া থাকিতেই হইবে, তখন কোনও কারণে তিনি আপনার স্বাস্থ্যভঙ্গ করিয়া সরকারের বদনাম করিতে অপারগ। জেলার সাহেবের কাছে রিপোর্ট পৌছিল ; তিনি আসিয়া দেখিলেন নন্দগোপাল ধীরে ধীরে গ্রাস পাকাইয়া বত্রিশ দাঁতে চৌষট্টি কামড় মারিয়া এক এক গ্রাস গলাধঃকরণ করিতেছেন। খুব খানিকটা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া তিনি নন্দগোপালকে বুঝাইয়া দিলেন, যে, কাজ যথা সময়ে শেষ করিতে না পারিলে বেত্রাঘাত অনিবার্য্য। নন্দগোপাল নিতান্ত ভদ্রভাবে স্বাস্থ্যনীতির পুনরাবৃত্তি করিয়া জেলার সাহেবকে মধুর হাস্যে জানাইলেন, যে, সরকার বাহাদুর যখন ১০টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত আহার ও বিশ্রামের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তখন তিনি ত নিজে সে আইন ভঙ্গ করিবেনই না ; অধিকন্তু জেলার সাহেবও যাহাতে সে আইন ভঙ্গ না করেন সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখিবেন। বলা বাহুল্য জেলার সাহেবের অঙ্গ জুড়াইয়া দ্রব হইয়া গেল ! তিনি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া মানে মানে প্রস্থান করিলেন। আহারাদি যথাসময়ে শেষ করিয়া নন্দগোপাল কুঠরীতে গিয়া ঢুকিলেন। বিব্রত পেটি অফিসার ভাবিল এইবার বুঝি কাজ আরম্ভ হইবে। নন্দগোপাল কিন্তু একখানি কম্বল লইয়া আস্তে আস্তে বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িলেন।

অজস্র গালাগালিতেও তাঁহার বিশ্রামের ব্যাঘাত হইল না, passive resistanceএ তিনি মহাত্মা গান্ধীরও গুরু। ১২টার সময় উঠিয়া নন্দগোপাল আরও এক ঘণ্টা ঘানি ঘুরাইলেন, যখন দেখিলেন যে বালতিতে প্রায় ১৫ পাউণ্ড তেল হইয়াছে, তখন বাকি নারিকেল বস্তায় বন্ধ করিয়া চুপচাপ বসিয়া রহিলেন। কাজের ত অর্দ্ধেক মাত্র হইয়াছে, বাকি অর্দ্ধেক এখন করিবে কে? নন্দগোপাল বলিলেন, "যাহার খুসি সেই করিবে। আমি ত আর সত্য সত্যই কলুর বলদ নই, যে, সমস্ত দিনই তেল পিষিব। দিনে ত ছয় পয়সারও খোরাক পাই না, তা ৩০ পাউণ্ড তেল পিষিব কেমন করিয়া!"

কর্ত্তৃপক্ষ মহলে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। তর্জ্জন গর্জ্জন অনেক হইল; কিন্তু নন্দগোপাল নির্ব্বিকার পরমপুরুষের মত নিষ্পন্দ এবং সদা স্মিতবদন। নন্দগোপালের নিকট হইতে ৩০ পাউণ্ড তেল বাহির হইবার কোন আশাই নাই দেখিয়া সুপারিন্‌টেনডেণ্ট সাহেব তাঁহাকে পায়ে বেড়ী দিয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য (till further order) কুঠরীতে বন্ধ রাখিতে আজ্ঞা দিলেন।

এদিকে বড় ঘানি ঘুরাইতে ঘুরাইতে অবিনাশের শরীর ভাঙ্গিয়া আসিল। দশটার পর তাহার আর কাজ করিবারই সামর্থ্য থাকিত না। ইন্দু আমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সবল; কয়েদীদের সহিত পরামর্শ করিয়া অবিনাশের বাকি কাজটুকু সে করিয়া দিয়া কোন রকমে এ যাত্রা তাহার পাপক্ষয় করাইয়া দিল।

এইরূপে আরও এক মাস কাটিল। ইতিমধ্যে জেলার সাহেব নন্দগোপালের সহিত একটা রফা করিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, যে, চার দিন পূরা কাজ করিলে তিনি ভবিষ্যতে তাঁহাকে ঘানি ঘুরান হইতে অব্যাহতি দিবেন। নন্দগোপালও রাজি হইয়া অল্পাধিক পরিমাণে অপরের সাহায্যে ৪ দিন পূরা কাজ দাখিল করিয়া সে যাত্রা নিষ্কৃতি পাইলেন।

এ নিষ্কৃতির আনন্দ কিন্তু অধিক দিন স্থায়ী হইল না। অল্প দিন পরেই আবার তাঁহাকে বড় ঘানি পিষিতে দেওয়াতে তিনি সে কাজ করিতে অস্বীকৃত হন। ফল—বেড়ি ও কুঠরী বন্ধ। হুকুম হইল সকলকে পুনরায় তিন দিনের জন্য ঘানি ঘুরাইতে হইবে। একে ত আমরা সকলে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য জেলে আবদ্ধ, তাহার উপর প্রত্যহ এই ঘানির বিভিষিকা। সকলেই বুঝিলেন যে কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে একটা সুবিধা রকমের পাকা বন্দোবস্ত করিয়া না লইতে পারিলে পোর্ট ব্লেয়ারেই ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হইবে। সাজা ত আছেই, তবে আর নিজের হাতে নিজেকে শাস্তি দেওয়া কেন? অনেকেই এবার ঘানিতে কাজ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইল।

কর্ত্তৃপক্ষও রুদ্রমূর্ত্তি ধরিলেন। জেলখানা ভরিয়া সে এক আনন্দোৎসব পড়িয়া গেল। সাজার উপর সাজা চলিতে লাগিল। ৪ দিন কঞ্জিভক্ষণ ও ৭ দিন দাঁড়া হাতকড়ি, ইহাই সাধারণতঃ সাজার প্রথম কিস্তি। গুঁড়া চাউল ফুটন্ত গরম জলে ঢালিয়া দিলে যে সুখাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাই আমাদের "কঞ্জি"। তাহাই মাপিয়া এক এক পাউণ্ড করিয়া দিনে দুইবার খাইতে দেওয়া হয়, এবং কয়েদী কোনও উপায়ে আর কিছু সংগ্রহ করিয়া খাইতে না পায় সে বিষয়ে কড়া পাহারা থাকে। জেলের শাস্ত্র অনুসারে ৪ দিনের অধিক এ কঞ্জি (penal diet) খাওয়াইবার নিয়ম নাই; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের আমাদের উপর দয়ার আধিক্যবশতঃই হোক, আর যে কোন কারণেই হোক আমাদের মধ্যে উল্লাসকর, নন্দগোপাল ও হোতিলালকে ১২।১৩ দিন এই কঞ্জি খাওয়াইয়া রাখা হয়। ১৯১৩ সালে যখন শ্রীযুক্ত রেজিনাল্ড ক্র্যাডক্ পোর্ট ব্লেয়ার পরিদর্শন করিতে যান, তখন নন্দগোপাল তাঁহার নিকট এই সম্বন্ধে অভিযোগ করেন; কিন্তু সাজা দিলেও জেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ টিকিটে এ সম্বন্ধে কোনও কথা লিখেন নাই। জেলার সাহেবও অম্লানবদনে বলিলেন

যে অভিযোগ মিথ্যা। সুতরাং ফল [illegible] হইল না। জেলারের বিরুদ্ধে কয়েদীর কথা প্রমাণ হয় না।

সাজার পর সাজা চলিতে লাগিল; [illegible] রকমের বেড়ীর পালা শেষ করিয়া আমাদের কুঠরীতে বন্ধ করা হইল। তাহারও একটু রকমারি আছে। সাধারণ কয়েদীদের কুঠরী বন্ধ করা হইলে তাহারা নীচে আসিয়া স্নানাহার করিতে পারে, অপর কয়েদীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবারও তাহাদের বাধা নাই। এখন নূতন আজ্ঞা প্রচারিত হইল যে আমাদের সঙ্গে কেহ কথা কহিলে তাহাকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। সুতরাং নামে পৃথক কারাবাস (Separate confinement) হইলেও কার্য্যতঃ আমাদের পক্ষে উহা নির্জ্জন কারাবাস (Solitary confinement) হইয়া দাঁড়াইল। অনেককেই তিন মাস বা ততোধিককাল এইরূপ কুঠরী বন্ধ অবস্থায় কাটাইতে হইল।

অনেকেরই এই সময় স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে লাগিল। এক পোর্ট ব্লেয়ারে ম্যালেরিয়ার প্রচণ্ড প্রকোপ, জ্বরজাড়ি লাগিয়াই আছে, তাহার উপর আমাশয় সুরু হইল। কর্ত্তৃপক্ষও বোধ হয় ভাবিলেন যে ব্যবস্থার একটু পরিবর্ত্তন দরকার। সেই জন্য আমাদের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া জন কয়েককে করোনেশন উৎসবের সময় জেলের বাহিরে Settlementএ পাঠান হইল। বারীন্দ্র গেলেন Engineering fileএ, অর্থাৎ রাজমিস্ত্রীর সহিত মজুরী করিতে, উল্লাসকর গেলেন মাটি কাটিয়া ইট বানাইতে, কেহ বা গেলেন জঙ্গলে (Forest Department)এর কাঠ কাটিতে, কেহ বা গেলেন রিক্শ টানিতে; আর কেহ বা গেলেন বাঁধ বাঁধিতে।

আমাদের কিন্তু অদৃষ্টগুণে 'উ টা বুঝিলি রাম' হইয়া দাঁড়াইল। জেলখানার মধ্যে কাজ যতই কঠোর হোক না কেন, সরকার হইতে নির্দ্দিষ্ট পূর্ণ খোরাক পাওয়া যাইত, আর জল বৃষ্টিতে বেশী ভিজিতে হইত না। বাহিরে গিয়া সে সুখটুকুও চলিয়া গেল। প্রাতঃকালে ৬টা হইতে ১০টা ও অপরাহ্নে

হইতে ৪॥০টা পর্য্যন্ত কঠোর পরিশ্রম ত করিতেই হইবে ; অধিকন্তু রৌদ্রে পুড়িতে ও বৃষ্টিতে ভিজিতে হয়। একে ত পোর্ট ব্লেয়ারে বৎসরে ৭ মাস বর্ষাকাল, তাহার উপর জঙ্গলে জোঁকের উপদ্রব। জঙ্গলে কাজ করিবার ভয়ে কত লোক যে পলাইতে চেষ্টা করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

একে ত এই কষ্ট, তাহার উপর পূরা খোরাক মিলে না। কয়েদীর খোরাক চুরি হইয়া বাজারে ও গ্রামে গ্রামে বিক্রীত হয়। সাধারণ কয়েদী হইতে ইউরোপীয় কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলেই এই চুরির কথা বেশ জানেন, কিন্তু চুরি কখনও বন্ধ হয় না। অধিকাংশ কর্ম্মচারীই ঘুসখোর, সুতরাং এ চুরি-রোগের প্রতিকার নাই। সাধারণ কয়েদী ইহার বিরুদ্ধে সহজে কিছু বলিতে চায় না, কেন না সে বিলক্ষণ জানে, যে, মুখ খুলিলেই তাহাকে বিপদে পড়িতে হইবে।

রোগের জন্য জেলের বাহিরে ৪টী হাসপাতাল, কিন্তু সেগুলি বাঙ্গালী Asst. Surgeon এর তত্ত্বাবধানে বলিয়া চিফ কমিসনার কর্ণেল বাড্‌নিং আদেশ দিলেন, যে, আমাদের অসুখ হইলে আমরা সে সমস্ত হাঁসপাতালে যাইতে পারিব না, আমাদিগকে জেলে ফিরিয়া আসিতে হইবে। জ্বরে ধুঁকিতে ধুঁকিতে বিছানা ও থালা বাটি ঘাড়ে করিয়া ৫।৭।১০ মাইল হাটিয়া আসা বড় সুবিধার কথা নয়। আর জেলে আসিয়াই বা সুচিকিৎসা কোথায়? হাসপাতাল সংলগ্ন কতকগুলি ছোট ছোট কুঠরীর মধ্যে আমাদের দিনে প্রায় ১১ ঘণ্টা পড়িয়া থাকিতে হইত, আর সেই কুঠরীর মধ্যেই একটি গামলায় আবার মলমূত্র ত্যাগের বন্দোবস্ত। বৃষ্টির সময় পিছনদিকের ঘুলঘুলি দিয়া জলের ছাট আসিবার বেশ সুব্যবস্থা আছে, কিন্তু কুঠরীতে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনের তেমন উপায় নাই। ১৯২০ সালে জানুয়ারী মাসে যে জেল-কমিসন পোর্ট ব্লেয়ার পরিদর্শন করিতে যান, তাঁহারা এই কুঠরীগুলির বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন, এ গুলির নাকি সংস্কার শীঘ্রই হইবে।

যাক সে কথা। এত দিন আমরা ভাবিয়াছিলাম, যে, বুঝি জেলের বাহির হইতে পারিলেই আমাদের দুঃখ কতকটা ঘুচিবে; কিন্তু সে আশা এবার নির্ম্মূল হইল। আমাদের জন্য জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ। সাধারণ কয়েদী ক্রমে ওয়ার্ডার, পেটি অফিসার বা লেখাপড়া জানিলে মুন্সি হইয়া কঠোর কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি পায়, কিন্তু আমাদের সে পথও বন্ধ।

এক এক করিয়া প্রায় সকলেই ক্রমে বাহিরের কাজ করিতে অস্বীকৃত হইয়া জেলে ফিরিয়া আসিলেন।

এই সময় একটী শোচনীয় ঘটনা ঘটিল। ইন্দুভূষণ উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিল। তাহার বলিষ্ঠ শরীর কঠোর পরিশ্রমেও কখন কাতর হয় নাই, কিন্তু জেলখানার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপমানে সে যেন দিন দিনই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল, মাঝে মাঝে বলিত—'জীবনের দশটা বৎসর এই নরকে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব।' এক দিন রাত্রে সে নিজের জামা ছিঁড়িয়া দড়ি পাকাইয়া পিছনের ঘুলঘুলিতে লাগাইয়া ফাঁসি খাইল। রাত্রেই জেলের সুপারিনটেনডেন্টকে টেলিফোন করা হইল, কিন্তু পর দিন বেলা ৮টা পর্য্যন্ত তাহার দেখা মিলিল না। সে দিন রাত্রে জেলারের সহিত যে সমস্ত প্রহরী ইন্দুভূষণের কুঠরীতে ঢুকিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে বলিল যে, তাহার গলার হাঁসুলীতে (neck ticket) একখণ্ড লেখা কাগজ বাঁধা ছিল। সত্যমিথ্যা ভগবান জানেন, কিন্তু সে কাগজের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। পরে আমরা জেলার সাহেবকে ঐ কাগজের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। পরে ইন্দুভূষণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলে পোর্ট ব্লেয়ারের ডেপুটী কমিসনারের উপর ঐ ভার অর্পিত হয়। ফলে কিছুই হইল না। ব্যাপারটা হজমবল হইয়া চাপা পড়িয়া গেল।

এই সময়ে অনেকেই ম্যালেরিয়ার তাড়ায় বাহির হইতে ভিতরে চলিয়া আসিতে লাগিলেন। উল্লাসকরও তাহাই করিলেন। তাঁহাকে রৌদ্রে ইট তৈয়ার করিতে দেওয়া হইয়াছিল। সেখানকার হাঁসপাতালের যিনি Junior medical officer তিনি বলিলেন যে উল্লাসকরের রৌদ্রে কাজ করা সহ্য হইবে না। কিন্তু বাঙ্গালী ডাক্তারের কথা গোরা overseer সাহেব গ্রাহ্য করিবেন কেন? উল্লাসকরকে সেই কার্য্যেই বাহাল রাখা হইল, ফলে তিনি কাজ করিতে অস্বীকৃত হইয়া পুনরায় জেলে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে শুধু পীড়নের ভয়ে কাজ করিতে হইলে মনুষ্যত্ব সঙ্কুচিত হইয়া যায়; সাজার ভয়ে কাজ করিতে তিনি রাজী নহেন। তাঁহার ৭ দিন দাড়া হাতকড়ির ব্যবস্থা হইল। কিন্তু সে সাত দিন আর পূর্ণ হইল না। প্রথম দিনই বেলা ৪৷৷০টার সময় হাতকড়ি খুলিতে গিয়া পেটি অফিসার দেখিল যে উল্লাসকর জ্বরে অজ্ঞান হইয়া হাতকড়িতে ঝুলিতেছে। তখনই তাঁহাকে হাঁস-পাতালে পাঠান হইল। রাত্রে শরীরের উত্তাপ ১০৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত চড়ে। প্রাতঃকালে দেখা গেল যে জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু উল্লাসকর আর সে উল্লাসকর নাই। আসন্ন বিপদের মধ্যেও যিনি চিরদিন নির্ব্বিকার, তীব্র যন্ত্রণায় যাহার মুখ হইতে কখনও হাসির রেখা মুছে নাই, তিনি আজ উন্মাদরোগগ্রস্ত!

জেলখানার প্রকৃত মূর্ত্তি যেন সেই দিন আমাদের চক্ষে ফুটিয়া উঠিল। বাঁচিয়া দেশে ফিরিবার ত আর আমাদের কোনও আশা নাই—কেহ ফাঁসি খাইয়া মরিবে, কেহ বা পাগল হইয়া মরিবে। আর যদি মরিতেই হয় তবে আর স্বহস্তে এই যন্ত্রণার বোঝা উঠান কেন? প্রায় সকলেই স্থির করিলেন, যে যত দিন আমাদের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা করা না হয় তত দিন কাজ কর্ম্ম করা হইবে না। এদিকে আমরা ultimatum দিয়া তাল ঠুকিয়া মরিয়া হইয়া রহিলাম, ওদিকে কর্ত্তৃপক্ষও তাঁহাদের তূণ হইতে চোখা চোখা বাণ হানিতে আরম্ভ করিলেন।

বেশ একচোট গজকচ্ছপের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ইহার কিছু পূর্ব্বে চুঁচুড়ার ননিগোপাল ও ঢাকার পুলিনবাবু প্রভৃতি ৩।৪ জন আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। ননিগোপাল ছেলেমানুষ হইলেও তাহাকে ঘানি প্রভৃতি কঠোর কর্ম্ম দেওয়া হয়। সেও বাধ্য হইয়া ধর্ম্মঘটে যোগ দিল। অন্য সকল কয়েদী হইতে পৃথক করিয়া আমাদের একটা আলাদা ব্লক বন্ধ রাখিয়া কর্তৃপক্ষ আমাদের উপর বাছা বাছা পাঠান প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। খাদ্যের পরিমাণ আরও কমাইয়া দেওয়া হইল, এবং যাহাতে আমরা পরস্পরের সহিত কোনরূপ কথাবার্ত্তা চালাইতে না পারি সে বিষয়েও সতর্কতার অভাব রহিল না। পাইখানায় গিয়া পাছে কথা কহি সে জন্য সম্মুখে প্রহরী খাড়া থাকিত। কিন্তু বাঁধন বেশ শক্ত করিতে গেলে অনেক সময় ছিঁড়িয়া যায়, আর আইনের প্রতি যাহাদের ভক্তি নাই, শুধু ভয় দেখাইয়া তাহাদের আইন মানাইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

আমরা প্রধানত তিনটা জিনিস চাহিলাম—ভাল খাওয়া পরা, পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি ও পরস্পরের সহিত মেলামেশার সুবিধা।

মধ্যে ৯।৫ কুঠরী ব্যবধান রাখিয়া এক এক জনকে বন্ধ করা হইল। ফলে কথাবার্ত্তা আগে আস্তে আস্তে হইতেছিল, এখন চীৎকার করিয়া চলিতে লাগিল। হাতকড়াতে ঝুলাইয়া রাখিলেও মানুষের মুখ ত আর বন্ধ করা যায় না। কর্তৃপক্ষের যেন সাপে ছুঁচো ধরা হইয়া দাঁড়াইল। সুনাম বা Prestige এর খাতিরে আমাদের আবদার শুনাও চলে না, আর এদিকে ধর্ম্মঘটও ভাঙ্গে না। এমন সময়ে আমাদের নূতন সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট বদলি হইয়া পুরাতন সুপারিন-টেনডেণ্ট ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পরামর্শে চিফ কমিসনার আমাদের জন কয়েককে সহজ কাজ দিয়া জেলের বাহিরে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। আমরা বলিলাম যে সকলকে যদি জেলের বাহিরে পাঠান হয় তাহা হইলে আমরা বাহিরে কাজ করিতে স্বীকৃত হইব, নচেৎ পুনরায় জেলে ফিরিয়া আসিব।

প্রায় ১০।১২ জনকে নারিকেল গাছের পাহারাওয়ালা করিয়া বাহিরে পাঠান হইল। নারিকেল গাছ সরকারী সম্পত্তি, তাহা হইতে নারিকেল না চুরি যায় ইহা দেখাই পাহারাওয়ালার কাজ। কাজ খুব সহজ, কিন্তু সকলকেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখা হইল, পাছে পরস্পর দেখা শুনা হয়।

জেলখানায় কিন্তু ধর্ম্মঘট চলিতে লাগিল। নন্দগোপাল ও ননিগোপালকে কিছু দিন পরে Viper দ্বীপে একটা ছোট জেলে বদলি করা হইল; সেখানে গিয়া ননিগোপাল আহার ত্যাগ করিল। জেল হইতে সকলকে বাহিরে পাঠাইবার যে কথা ছিল তাহা আর কার্য্যে পরিণত হইল না।

এদিকে যাঁহাদিগকে জেলের বাহিরে কাজ করিতে পাঠান হইয়াছিল, তাহারাও একজোটে কর্ম্মত্যাগ করিলেন। পরস্পরের ঠিকানার সন্ধান লইয়া ধর্ম্মঘটের আয়োজন করিতে প্রায় এক মাস অতিবাহিত হইল। তিন মাসের সাজা লইয়া তাঁহারা যখন জেলে ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেখা গেল যে জেলখানার ধর্ম্মঘট প্রায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নিরাশ হইয়া অধিকাংশই কাজ করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ননিগোপালকে ৪ দিন অনশনের পর জেলে ফিরাইয়া আনা হইল; নাকে রবারের নল পুরিয়া তাহার অল্প অল্প দুগ্ধপানের ব্যবস্থা করা হইল, পাছে সে মরিয়া গিয়া কর্ত্তৃপক্ষের বদনাম করে। সেবারকার ধর্ম্মঘটের কর্ম্মভোগের বোঝা ননিগোপাল, বীরেন প্রভৃতি দুই তিনটী ছেলেকেই বহিতে হয়। সাজার পর সাজা খাইয়া বিফল মনোরথ হইয়া একে একে সকলেই ধর্ম্মঘট ছাড়িল; শেষে একা ননিগোপাল যেন মরণপণ করিয়া বসিল।

দিনের পর দিন কাটিয়া গেল, ননিগোপাল কঙ্কালের মত শীর্ণ হইয়া পড়িল, কিন্তু আপনার গোঁ ছাড়িল না। যখন সে দেড় মাসের অধিক অনশন ক্লিষ্ট, তখনও তাহাকে দাঁড় করাইয়া হাতকড়িতে ঝুলাইয়া রাখিতে কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্কোচ বোধ হয় নাই। ফলে দেখিতে দেখিতে আবার Hunger strike

ছড়াইয়া পড়িল এবং কর্ত্তৃপক্ষের শত সাবধানতা সত্ত্বেও ইন্দুভূষণ, উল্লাসকর ও ননিগোপালের কথা দেশের কাণে আসিয়া পৌছিল। সংবাদপত্রে সে সমস্ত বিষয় আলোচনার ফলে ডাক্তার Lukis সাহেবকে গবর্ণমেণ্ট তদন্তের জন্য পোর্ট ব্লেয়ারে পাঠান। Lukis সাহেবের রিপোর্ট আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার রিপোর্টের ফলে উল্লাসকরকে মাদ্রাজের পাগলা গারদে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং অপর সকলেও অল্প দিনের জন্য একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাচে।

ননিগোপালকেও অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাহার বন্ধুবান্ধবেরা আহার করিতে স্বীকৃত করান, এবং ইহার অল্প দিন পরেই যাহারা তিন মাসের সাজা লইয়া জেলখানায় আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় তাঁহাদিগকে আবার জেলের বাহিরে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

ধর্ম্মঘটের প্রথম পর্ব্ব এইখানেই সমাপ্ত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মঘটের ফলাফল।

বিধি যাহার প্রতি বাম তাহার মরিয়াও নিস্তার নাই। আমরা বাহিরে রহিলাম বটে, সুখে দুঃখে একরূপ দিন কাটিতে লাগিল, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আবার জেলখানা হইতে গোলমালের সংবাদ পাইলাম। উৎপীড়িত হইয়া ননিগোপাল আবার কর্ম্মত্যাগ করিয়া বসিয়াছে! শাস্তিস্বরূপ তাহাকে চটের কাপড় পরিতে দেওয়ায় সে তাহা পরিতে অস্বীকৃত হয়! জোর করিয়া তাহার জাঙ্গিয়া কাড়িয়া লইয়া তাহার কুঠরীর মধ্যে চটের জাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু সে "Naked we came out of our mother's womb and naked shall we return—'মায়ের পেট হইতে নগ্ন এসেছি, নগ্নই ফিরে যাব' এই মন্ত্র আওড়াইতে আওড়াইতে চটের জাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিয়া উলঙ্গ হইয়া বসিয়া থাকে! গলার টিকিট ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেয়, চিফ কমিশনার কাছে আসিলে দাঁড়ায়ও না, সেলামও করে না। কি চাও জিজ্ঞাসা করিলে বলে—"কিছুই চাই না" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছেলেটা কি শেষে পাগল হইয়া গেল?—এই ভাবনাই সকলের মনে উঠিল। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গেল—না, জ্ঞান বেশ টনটনে আছে। ইংরাজ যখন নিজের খুসীমত আইন আদালত বানাইয়াছে, সে সকল ব্যবস্থার সহিত যখন তাহার দেশের লোকের কোনও সম্বন্ধ নাই, তখন সে কেন যে সে সমস্ত আইন ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ মাথা পাতিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য এ প্রশ্নের মীমাংসা লইয়াই সে ব্যস্ত। তাহার ধর্ম্ম বুদ্ধি যাহাতে সায় দেয়

না, শুধু প্রাণটা বাঁচাইবার জন্য সে কেন সে কাজ করিতে যাইবে? প্রাণ রাখিতে রাখিতেই যেখানে প্রাণান্ত হইতে হয়, সেখানে প্রাণের মূল্য কতটুকু?

ভগবান যাহার মনটির উপর স্বাধীনতার ছাপ লাগাইয়া দিয়াছেন, অতি বড় প্রচণ্ড শাসন কর্ত্তাও তাহার শরীরকে চিরদিন পরাধীন করিয়া রাখিতে পারে না, এই আশ্বাস ও অভয় ভিন্ন আমরা তাহার প্রশ্নের আর যে কি উত্তর দিব তাহা খুঁজিয়া পাইলাম না।

এদিকে আমাদেরও কপাল ভাঙ্গিল। কলিকাতার কাগজে এই সময় আন্দামানের রাজনৈতিক কয়েদীদিগের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল; কর্ত্তৃপক্ষের ধারণা আমরাই সে সমস্ত সংবাদ পাঠাইতে ছিলাম। আমরাও যে সকল বিষয়ে আইন কানুন মানিয়া চলিতে পারিতাম তাহা নহে। পেটের জ্বালায় নানা স্থান ঘুরিয়া আমাদের ফলটা পাকড়টা ও মুখরোচক কিছু কিছু আহার্য্য সংগ্রহ করিতে হইত, আর সাধারণ কয়েদীর সহিত মেশা একরূপ অসম্ভব বলিয়াই আমাদের লুকাইয়া লুকাইয়া বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না করিলে প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত। কর্ত্তারা হয় তাহা বুঝিলেন না; অথবা না বুঝিবার ভাণ করিয়া আমাদের বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে কথা ভগবানই জানেন।

এক দিন সুপ্রভাতে চারিদিকে তল্লাসীর ধূমধাম পড়িয়া গেল। আমাদের থাকিবার বসিবার শুইবার সব স্থান পুলিসে ঘেরাও করিয়া ফেলিল। মানিকতলা বাগানের একটা প্রহসনাত্মক পুনরাভিনয়—tempest in a tea pot হইয়া গেল। দুই একখানা বাজে চিঠি ও এক আধটা কবিতা ভিন্ন আর কিছুই মিলিল না, কিন্তু চিফ কমিশনারের আদেশ মত আমাদের সকলকেই জেলে পাঠান হইল। ক্রমে নানারূপ গুজব শুনিতে লাগিলাম, আমরা নাকি বোমা বানাইয়া পোর্ট ব্লেয়ার উড়াইয়া দিয়া, একখানা সরকারী

steamer পাকড়াও করিয়া পলাইয়া যাইবার সংকল্প করিয়াছিলাম ; আর অন্তর্যামী চিফ কমিসনার লালমোহন সাহা নামক এক হিতৈষী কয়েদীর কথায় সেই আসন্ন বিপদ হইতে তাঁহার রাজ্যটীকে রক্ষা করিবার জন্য এই সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন ! চিফ কমিসনার জেলে আসিলে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম—'কর্ত্তা, ব্যাপারখানা কি ? অধীনদের উপর এ অযথা আক্রমণ কেন ?" কর্ত্তা নিতান্ত ভাল মানুষটীর মত বলিলেন—"আমি কিছুই জানি না। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যেরূপ আদেশ পাইয়াছি সেইরূপই করিয়াছি।"

ভাল, এ কথার আর উত্তর কি ! কিন্তু কিছু দিন পরে শুনিলাম আমাদের সহিত মিশিত বা কথাবার্ত্তা কহিত বলিয়া বাহিরের অনেক লোককে সাজা দেওয়া হইতেছে, এবং পুলিশের একজন সাক্ষী কোথা হইতে গ্রামোফোনের পিন, লোহার টুকরা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া নিঃসংশয়ে আমাদের বোমা সৃষ্টির দুরভিসন্ধি প্রমাণ করিয়া ফেলিয়াছে। নারায়ণগড়ে লাট সাহেবের ট্রেণ ভাঙ্গা লইয়া যখন জনকতক নিরপরাধ লোক দণ্ডিত হয়, তখন হইতেই আমরা পুলিসের অপার মহিমার কথা বেশ জানিতাম। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলাম আমাদের বিরুদ্ধে যদি কোনও সন্দেহ বা প্রমাণ থাকে, তাহা হইলে এইরূপ চোরাগোপ্তা চাল না চালিয়া আমাদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হয় না কেন ?" কর্ত্তারা কিন্তু এ কথার কোনও উত্তর না দিয়াই মুখ টিপিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলাম।

মাস কয়েক পরে সার রেজিনাল্ড ক্র্যাডক্ (Sir Reginald Craddock) পোর্ট ব্লেয়ার পরিদর্শন করিতে যান। আমরা ভাবিলাম খুব কাপ্তেন পাকড়াইয়াছি ; এইবার আমাদের যা' হয় একটা ব্যবস্থা হইবে। তাঁহার নিকট দুঃখের কাহিনী আরম্ভ করিতে না করিতেই চিফ কমিসনার নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "তোমরা বাহিরে রাজদ্রোহের পরামর্শ (Conspiracy) করিতেছিলে।"

আমরা জবাব দিলাম, "তাই যদি আপনার ধারণা, ত প্রথমে যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তখন ভাল মানুষ সাজিয়া 'জানি না' বলিয়াছিলেন কেন? আর সে কথা বলিবার পরে যদি আমাদের অপরাধের প্রমাণ পাইয়া থাকেন, ত প্রকাশ্য আদালতে আমাদের বিচার করিতে এত সঙ্কোচ বোধ করেন কেন?" সার রেজিনাল্ড মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন—"কি জান,—এ সব কথা প্রমাণ হয় না।"

ননিগোপালও তাহার সমস্ত ইতিহাস বিবৃত করিল; মহামান্য ক্র্যাডক সাহেব শুধু উত্তর করিলেন—"তুমি সরকারের শত্রু, তোমাকে মারিয়া ফেলাই উচিত ছিল।"

"তাই যদি উচিত, ত আইন আদালতের এ ঠাট সাজাইয়া রাখিয়া বৃথা পয়সা খরচ কেন? কাজটা সংক্ষেপে সারিলেই ত ছিল ভাল।"

বিচার ত এই খানে সাঙ্গ হইয়া গেল। এখন উপায়? নিরুপায়ের যিনি উপায়, তিনি না মুখ তুলিয়া চাহিলে আর গত্যন্তর নাই। কিন্তু এবার তাঁহারও সিংহাসন বুঝি টলিয়াছিল।

এক এক করিয়া প্রায় সকলেই পুনরায় কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া দিল। জেলের কর্ত্তৃপক্ষ সাজা দিয়া যখন হাঁপাইয়া পড়িলেন, তখন যাঁহারা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত নন তাঁহাদিগকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। ডেপুটী কমিসনার Lowis সাহেবের উপর সেই ভার পড়িল। তিনি বিচারের পূর্ব্বে এক দিন ধর্ম্মঘটের কারণ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিয়া অনুসন্ধান করিতে আসিলেন।

আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা যে আমাদিগের প্রতি সাধারণ কয়েদী অপেক্ষা ভাল ব্যবহার করা না হয়; এ বিষয়ে পোর্ট ব্লেয়ারের কাহারও কোনও হাত নাই। "কিন্তু সাধারণ কয়েদীর যে সমস্ত সুবিধা আছে,

আমাদের সে সমস্ত কিছুই নাই। সাধারণ কয়েদী লেখাপড়া জানিলে আফিসে ভাল কাজ কর্ম্ম পায়; তাহারা লেখাপড়া না জানিলেও 'ওয়ার্ডার' পেটি অফিসার হইতে পারে, আমরা যে সে সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত; অপরে ৫ বৎসর পরে মাসে ৸০ আনা করিয়া মাহিনা পায় এবং ১০ বৎসর পরে নিজে উপার্জ্জন করিয়া খাইতে পারে, আর আমাদের যে চিরদিনই জেলে পচিয়া মরিবার ব্যবস্থা!" Lowis সাহেব উত্তর করিলেন যে এ সমস্ত ব্যবহার ও দায়িত্ব ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের। এক জন জিজ্ঞাসা করিলেন—"সাহেব ভাল করিবার কোন অধিকারই তোমাদের নাই, শুধু কি সাজা দিবার অধিকারটুকুই হাতে রাখিয়াছিলে?"

সাহেব হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—"কি করিব? জেলের শান্তি discipline ত রক্ষা করিতে হইবে।"

"ন্যায়ই হোক, অন্যায়ই হোক, deciplineটা রক্ষা করিতেই হইবে মোট কথাটা এই, না?"

সাহেব এ কথায় কোনও উত্তর দিলেন না। ব্যাপারটা কি তাহা তিনি বেশই জানিতেন; কিন্তু তিনিও ত সরকারী চাকর। তাই কাহারও এক মাস, কাহারও তিন মাস, কাহারও বা ছয় মাস সাজা বাড়াইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। ভবিষ্যতে এক বার ইঁহার সহিত আমাদের দেখা হইয়াছিল। কথা প্রসঙ্গে উল্লাসকরের কথা উঠিলে তিনি বলেন—"Ullaskar is one of the noblest boys I have ever seen; but he is too idealistic।" 'উল্লাসের মত মহাপ্রাণ ছেলে খুব কম দেখিয়াছি, তবে সে বড় বেশি উচ্চভাবপ্রবণ।' অথচ চাকরীর খাতিরে তাঁহাকে উল্লাসকরকে সাজা দিতেও হইয়াছিল।

Discipline আইন কানুন রক্ষার জন্য ত সাজা, কিন্তু ক্রমশঃ সেই শান্তি রক্ষাই দায় হইয়া উঠিল। আমাদের দেখাদেখি সাধারণ কয়েদীদের

মধ্যেও ধর্ম্মঘটের দল বাড়িয়া উঠিল। জেলের কাজকর্ম্মের ক্ষতি হইতে লাগিল। কর্ত্তৃপক্ষ দেখিলেন একটা কিছু না করিলেই নয়।

রাজনৈতিক অপরাধীর মধ্যে যাঁহারা মেয়াদী কয়েদী (Term convict) তাঁহাদের ৭।৮ জনকে হঠাৎ একদিন দেশের জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হইল, এবং যে জেলার আমাদের গালাগালি দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই তিনিই একদিন নিতান্ত ভদ্রভাবে আমাদের ধর্ম্মঘট ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন—"Now you can retreat with honour"—'এখন তোমরা আপন সম্মান বজায় রেখে কাজে নেমে পড়তে পার'। তিনি নাকি সংবাদ পাইয়াছেন যে অধিকাংশ মেয়াদী কয়েদীকে দেশের জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে; এবং যাঁহারা পোর্ট ব্লেয়ারে থাকিয়া যাইবেন তাঁহাদের কাজকর্ম্ম ও আহারাদির একটু বিশেষ ব্যবস্থা হইবে।

আমরা বলিলাম—"তথাস্তু, কিন্তু দুই মাসের মধ্যে যদি আপনাদের বিশেষ ব্যবস্থার নমুনা না দেখা যায়, তাহা হইলে পুনর্মূষিক হইয়া আমরাই বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া লইব।"

এইরূপে উভয় পক্ষে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ায় ধর্ম্মঘটের দ্বিতীয় পর্ব্ব সমাপ্ত হইল।

অল্পদিনের মধ্যে আলিপুরের বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র ও উপেন্দ্র, ঢাকার পুলিনবিহারী ও সুরেশচন্দ্র এবং নাসিকের সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয় ও যোশী ভিন্ন অপর সকলকে দেশের জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। বিশেষ ব্যবস্থারও সংবাদ আসিল। তাহা এই :—

১। মাফ লইয়া ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত আমাদের জেলের মধ্যে থাকিতে হইবে আর তাহার পর আমাদের পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি দিয়া বেকার কয়েদীর সুবিধা দেওয়া হইবে। জেলের বাহিরে ছাড়িয়া দিবার কথা ১৪ বৎসর পরে বিবেচিত হইবে।

২। জেলের মধ্যে অবস্থিতি কালে আমরা বাহিরের কয়েদীদিগের ন্যায় সমস্ত সুবিধা পাইব। অর্থাৎ পাঁচ বৎসর গত হইলে আমরা জাঙ্গিয়ার বদলে কাপড় পরিতে পাইব, মাসে আমাদিগকে নগদ ৵৹ দেওয়া হইবে এবং আমরা স্বহস্তে পাক করিয়া খাইবার অধিকার পাইব।

৩। প্রত্যেক বৎসরে আমাদের আচরণ সম্বন্ধে রিপোর্ট ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট যাইবে; এবং দশ বৎসর অতীত হইলে সরকার বাহাদুর আমাদের জন্য আরও ভাল ব্যবস্থা করিতে পারেন কি না বিবেচনা করিবেন।

৪। অতঃপর আমরা সর্ব্বপ্রকার সাধারণ কয়েদীর সুখ সুবিধা পাইব, এবং (রাজনীতিক বলিয়া) বেতের সাজা হইতে অব্যাহতি পাইব না।

যাই হোক, মন্দের ভাল। কর্ত্তারা একেবারে বঞ্চিত না করিয়া তবু কিঞ্চিৎ দিয়াছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মঘটের পুনরাবির্ভাব।

মেয়াদী কয়েদীদিগকে যখন ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেওয়া হইল, তখন আমরা কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। যে ছয় সাত জন বাকি রহিলাম তাহাদের যখন পোর্ট ব্লেয়ারে থাকিতেই হইবে তখন আর বেশী গোলমাল করিয়া লাভ কি? ছাড়া পাইবার যখন কোন আশাই নাই, তখন মরণের অপেক্ষায় শান্তভাবে দিন কাটানই ভাল।

কিন্তু অদৃষ্টে সে শান্তি আমাদের ছিল না। ১৯১৪ সালে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ভারতবর্ষে যে চাঞ্চল্যের স্রোত আসিয়া ধাক্কা মারিল, তাহার ফলে লাহোর ষড়যন্ত্রের উৎপত্তি ও 'গদর' দলের প্রায় ৫০ জনের পোর্ট ব্লেয়ারে আগমন। পল্টনের অনেক শিখ সিপাহীও রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত হইল। বাংলাদেশ হইতেও ১৫।১৬ জন আসিল। ফলে পোর্ট ব্লেয়ারের জেলখানা এবার রাজনৈতিক কয়েদীতে ভরিয়া এ সুখের নরক গুলজার হইয়া উঠিল। ইহাদের মধ্যে ৪।৫ জন ভিন্ন অপর কাহাকেও ঘানি ঘুরাইতে দেওয়া হয় নাই; কিন্তু নারিকেলের ছোবড়া পেটাও বড় কম পরিশ্রম নহে। তাহার উপর আর এক উপসর্গ এই, যে, সরকারী খোরাকে ইহাদের পেট ভরে না। একে ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লম্বা চওড়া পাঞ্জাবী, তাহার উপর অনেকেই বহুদিন আমেরিকায় থাকার ফলে যথেষ্ট পরিমাণে মাংসাদি খাইতে অভ্যস্ত। সুতরাং ২খানা রুটী ও এক বাটী ভাত ইহাদের পেটের এক কোণে কোথায় তলাইয়া যায় তাহার সন্ধানও পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ অবমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পাত্রও ইহারা

নহেন। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই জেলের কর্তৃপক্ষগণের সঙ্গে ইঁহাদের নরম গরম খটাখটি বাধিয়া উঠিল।

ঝান্সির পরমানন্দকে লইয়াই ঝগড়া আরম্ভ হইল। কি একটা কথা লইয়া তাঁহাকে জেলারের নিকট লইয়া যাওয়া হয়। জেলার আপনার কর্তৃত্ব জানাইয়া যে ওজনের কথা কহিলেন পরমানন্দও সেই ওজনের কথা ফিরাইয়া দিলেন। মুখোমুখি শেষে হাতাহাতিতে দাঁড়াইল। বিচারে পরমানন্দের বিশ ঘা বেত্রদণ্ড হওয়ায় ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইল। কিন্তু তাহা অধিক দিন স্থায়ী হইল না। জেলার নিজেই সকলকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া ভবিষ্যতে সদ্ব্যবহার করিবার আশা দিয়া সে ধর্ম্মঘট ভাঙ্গাইয়া দিলেন।

অসন্তোষের বীজ কিন্তু মরিল না। দিন কত পরে সামান্য কারণে আবার গোলমাল বাধিল। রবিবারে কয়েদীদের ছুটী, সেদিন আপন আপন বস্ত্রাদি পরিষ্কার ভিন্ন অন্য কর্ম্ম হইতে তাহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। পোর্ট ব্লেয়ারে কিন্তু সেদিন জেলের উঠানের ঘাস ছিঁড়িতে হয়। একেত ছুটীর দিন সমস্ত দুপুর বেলা কয়েদীদিগকে কুঠরীর মধ্যে বদ্ধ থাকিতে হয়, তাহার উপর সকাল বেলা ঘাস ছিঁড়িয়া বেড়াইতে হইলে তাহাদের ছুটী নিতান্তই নামমাত্র হইয়া দাঁড়ায়। আমেরিকার 'গদর' পত্রিকার সম্পাদক জগৎরাম প্রভৃতি কয়েকজন এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া রবিবারে ঘাস ছিঁড়িতে অস্বীকৃত হন। সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেবের বিচারে তাঁহাদের প্রত্যেকের ছয় মাস করিয়া বেড়ি ও কুঠরীবদ্ধ হয়। বলাবাহুল্য লঘুপাপে এই গুরুদণ্ড দেখিয়া কেহই বিশেষ প্রীত হন নাই। তাহার পর, দিনের পর দিন যখন কষ্টের মাত্রা কমিবার কোনই সম্ভাবনা দেখা গেল না, তখন অনেকেই আবার কাজকর্ম্ম ত্যাগ করিলেন। এই সময় একটা ব্যাপার লইয়া বড় গোলমাল হয়। একজন বৃদ্ধ শিখের সহিত জেলের প্রহরীদিগের বিবাদ হয়; তিনি বলেন যে প্রহরীরা তাহাকে কুঠরীর মধ্যে লইয়া গিয়া অত্যন্ত প্রহার করে।

সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন, ফলে কিন্তু তিনি দুই একদিনের মধ্যে কঠিন রক্ত-আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া হাসপাতালে আসেন। সেখানে যক্ষ্মারোগের সূত্রপাত হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মারা পড়েন। সেখানকার অনেকের বিশ্বাস যে গুরুতর প্রহারই তাঁহার মৃত্যুর কারণ, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষগণ একথার সত্যতা অস্বীকার করেন। এই ব্যাপারের কোনও প্রতীকার হইল না ভাবিয়া ৪।৫ জন আহার ত্যাগ করিলেন। পৃথ্বী সিং তাঁহাদের অগ্রণী; তাঁহাকে নাক দিয়া জোর করিয়া দুধ খাওয়াইয়া দেওয়া হইত। এ অবস্থায় তিনি পাঁচ মাস থাকেন। অন্যদেশ হইলে একটা হুলস্থূল পড়িয়া যাইত; কিন্তু পোর্ট ব্লেয়ারের সংবাদ কে রাখে? সেখানে দুই দশ জন কয়েদী মরিলেই বা কাহার কি আসে যায়?

শিখদের মধ্যে আরও ৩।৪ জন এই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া দুই তিন মাস ভুগিয়া মারা পড়েন। শ্যামদেশ হইতে ধৃত পণ্ডিত রামরক্ষার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জেলে ঢুকিবার সময় পৈতা কাড়িয়া লওয়া হয় বলিয়া তিনি আহার ত্যাগ করিয়াছিলেন; এই সময় যক্ষ্মারোগে তাঁহারও মৃত্যু হয়। অব্যাহতির অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া একজন একখণ্ড সিসা খাইয়াও মরিয়াছিলেন।

যাঁহারা মরিলেন তাঁহারা ত বাঁচিয়া গেলেন; যাঁহারা পাগল হইয়া জীবন্ত মরিয়া রহিলেন, তাঁহাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। বালেশ্বর মোকর্দ্দমার যতীশচন্দ্র পাল তাঁহাদের অন্যতম। কুঠরীবদ্ধ অবস্থায় তিনি একেবারে উন্মাদ হইয়া যান। তাঁহাকে পাগলা গারদে পাঠান হয়; পরে ভারতবর্ষে লইয়া আসা হয়। এখন বহরমপুর পাগলা গারদে তাঁহার দিন কাটিতেছে।

এরূপ ঘটনার সংখ্যা নাই। কাহার কথা ছাড়িয়া কাহার কথা লিখিব? ছত্র সিংহ নামে একজন শিখ লায়লপুর খালসা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। দেশে তাঁহার অপরাধ কি জানি না; কিন্তু পোর্ট ব্লেয়ারে তাঁহাকে প্রথম হইতে

কুঠরীবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়। ধর্ম্মঘট লইয়া যখন গোলযোগ চলিতেছিল, তখন তিনি একদিন উত্তেজিত হইয়া সুপারিনটেনডেণ্টকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করেন বলিয়া প্রবাদ। ফলে প্রহরীগণ তাঁহাকে মারিতে মারিতে অজ্ঞান করিয়া ফেলে। তাহার পর তাঁহাকে যে কুঠরীতে পোরা হয় তাহা হইতে তাঁহাকে দুই বৎসরের অধিক কাল আর বাহির করা হয় নাই। বারান্দার এক কোণে জাল দিয়া ঘিরিয়া তাঁহার জন্য পিঁজরা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; সেই পিঁজরার মধ্যেই তাঁহাকে আহার, ভাঁড়ে শৌচ প্রস্রাবাদি ত্যাগ, ও রাত্রিকালে নিদ্রা যাইতে হইত। ইহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া তাঁহাকে ক্রমে মরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল, এ কথা বলাই বাহুল্য। আর একজন শিখ অমর সিংএরও ঐরূপ অবস্থা।

মৃত্যুর হার যখন ক্রমে বাড়িতেই চলিল, তখন কর্ত্তৃপক্ষদিগের একটু হুঁস হইল। অনেককে অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ (দড়ি পাকান) দেওয়া হইল। জগতরাম বহুদিবস পৃথক-কারাবাসের (separate confinement) ফলে শিরোরোগে ভুগিতে ছিলেন, তাঁহাকে ও অপর দুই এক জনকে ছাপাখানার কাজ দেওয়া হইল। দয়ানন্দ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ভাই পরমানন্দ ধর্ম্মঘটে কখনও যোগ দেন নাই বলিয়া তাঁহাকে হাঁসপাতালে কম্পাউণ্ডার করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু অধিকদিন সে সুখ তাঁহাকে ভোগ করিতে হইল না। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার চিঠি হইতে একখণ্ড উদ্ধৃত করিয়া সংবাদপত্রে রাজনৈতিক কয়েদীদিগের অবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়া পাঠান। চিফ কমিসনার ইহাতে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া পরমানন্দকে বিনা বিচারে হাজতে বন্ধ করিলেন। পরমানন্দ বলেন যে তাঁহার এই চিঠি যথারীতি জেলের সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেবের হাত দিয়া পাস হইয়া গিয়াছিল। সে কথা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই, কিন্তু তথাপি পরমানন্দ লাঞ্ছনা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না। জীবনের সহিত এ লাঞ্ছনা চিরকাল জড়িত থাকিবে দেখিয়া তিনি

আহার ছাড়িয়া জীবন ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। সুখের বিষয় ইহার অল্পদিন পরেই সম্রাটের ঘোষণা অনুযায়ী তাঁহাকে মুক্ত করা হয়। যাহারা এখনও জেলে পড়িয়া আছে, সে রাজনৈতিক কয়েদীদের দুরবস্থা কবে ঘুচিবে কে জানে?

নবম পরিচ্ছেদ।

কয়েদীর অধঃপতনের কারণ।

কয়েদীর কথা আমরা দেশে কেহ কিছু জানি না। বাঙ্গালী কিই বা জানে? যেমন করিয়া হউক প্রায় লক্ষাধিক লোক—আমাদেরই সমাজের দীন হীন বিকৃতচরিত্র পতিত জন আমাদের চির অবহেলায় পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ যে ইহ জীবনেই কি দুঃখের নরকে বাস করিতেছে তাহার সন্ধান আমরা রাখি না। আমাদের ঘরের মা বোনের দুঃখ অজ্ঞান ও দীনতার ভাবনা দু' এক জন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ মাঝে মাঝে না জানি আমাদের কোন্ পুণ্যফলে এ দেশে জন্মিয়া ভাবিয়া যান, আমরা নিজে পারতপক্ষে ভাবি না; অধিকন্তু ভাবিবার জন্য তাঁহাদের অভিসম্পাত করি। সুতরাং সমাজের পদস্খলিত অপরাধীর কথা ভাবিবার কথায় আমরা হাসিয়া অস্থির হইবই তো। কিন্তু যে দিন কাল পড়িয়াছে, আর এ কথা না ভাবিয়া গতি নাই। আত্মজনকে অবহেলা, হতাদর ও পীড়ন করা পাপের বোঝা যে আমাদের জমিয়া জমিয়া পাহাড় হইতে চলিল, সে পাপস্পর্শে দেশমায়ের প্রাণ-অহল্যা যে পাষাণে পরিণতা হইয়াছে! এ অসাড়তা ও পক্ষাঘাত হইতে এখন যে জাতিকে বাঁচিতেই হইবে।

প্রতি বৎসর গড়পড়তা প্রায় এক হাজার বার শ' লোক আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হয়। ষোল সতের বৎসরের বালক হইতে পঞ্চাশোর্দ্ধ বৃদ্ধ অবধি ডাক্তারের কৃপায় দেশান্তরী হইবার উপযোগী বিবেচিত হইয়া এখানে আসে। সরকার বাহাদুরের কায়দা কানুনে অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটিই নাই, বড় সিভিল সার্জ্জনের দ্বারা পাস না হইলে কোন কয়েদীকেই আন্দামানে পাঠান হয় না সত্য; কিন্তু হইলে কি হইবে, যে ডাক্তার কয়েদীকে পরীক্ষা করিয়া পাস

করিবে সে যদি হৃদয়হীন ব্যক্তি হয়, তাহা হইলে কোন ও গতিকে আপন কাজ করিয়া যাইতে পারিলেই সে বাঁচে। আর সতরটা কাজের মধ্যে এও তাহার একটা কাজ; হয়ত সকালে উঠিয়া কাজ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া আবার দুই শ' কয়েদীর একটা চালান তাহাকে পরীক্ষা করিতে হইবে। অগত্যা ডাক্তার সাহেব ঝড়ের মত আসে, প্রত্যেকের কাছে মিনিট খানেক দাঁড়াইয়া তাহার জিভ দেখিয়া এখান ওখান টিপিয়া যাহা হয় একটা লিখিয়া দিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে।

আমি গত দশ বৎসরে খুব কম হইলেও কয়েদীর দুইশ' আড়াইশ' চালান আসিতে দেখিয়াছি। যখন এই কয়েদীর দল এখানে আসে, তখন তাহারা জেলখানায় একেবারে আনাড়ি; হয়তো অধিকাংশই হঠাৎ এক দিন রাগের বশে কোন অত্যাচার বা অবিচারের তাড়নায় (under grave provocation) খুন করিয়াছে। প্রত্যেক চালানে শতকরা ১৫ জন ত একেবারে নির্দ্দোষীই থাকে, পুলিশ বা জমিদার বা স্বগ্রামবাসী শক্রর ষড়যন্ত্রে তাহাদের এ বিপত্তি। শতকরা ১০ জন দাগীচোর বা পেশাদার কুকর্ম্মাসক্ত লোকও (habitual criminal) তাহাদের মধ্যে থাকে; জীবনে প্রথম পদস্খলিত (Casual criminal) অধিকাংশ নির্দ্দোষ অপরাধীদের পবিত্র জীবন তাহাদের সংস্পর্শে কলুষিত হইতে আরম্ভ হয়। তাহার পর এই চালান সেলুলার জেলে আসিয়া বিভিন্ন ব্লকে ছড়াইয়া পড়ে; তখন তাহাদের জীবনের নির্ম্মল জলে যে পঙ্ক, যে আবর্জ্জনা আসিয়া নিত্য মিশিতে থাকে, তাহাতে তাহাদের চরিত্রগত স্বাভাবিক দেবত্ব ও মনুষ্যত্বের উচ্ছেদ হইয়া নিছক পশুত্বের বিকাশ করে। এই অধঃপাতের কারণ সেলুলারের দাগী পুরাতন চোরের (Jail birds) দল।

ভারতের প্রত্যেক জেলের মত সেলুলারেও কয়েদীর মধ্যে তিন রকম প্রকৃতির লোক আছে; যথা কুচরিত্র সুচরিত্র, আর মাঝামাঝি নিরীহ দুর্ব্বল

চিত্তের দল। যাহাদের প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণা দৈবী ও কল্যাণমুখী, জেলের আইন কানুন দণ্ড তাড়না তাহাদের জন্য আবশ্যক নাই, তাহারা নিজেই ফুলের মত মধু গন্ধ পরাগে দলটির পর দলটি মেলিয়া ফুটিতে থাকে। কারাগৃহের শাসন তাড়না দণ্ড এবং এই দুঃখের জীবনের বেদনা অভাব সে কষিত-কাঞ্চনের শোভা অগ্নিশুদ্ধ করিয়া প্রোজ্জ্বলই করিয়া দেয়, ম্লান করিতে পারে না।

যাহাদের স্বভাব-প্রেরণা জন্মাবধি ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা ও কলুষের দিকে, তাহারা কারাজীবনের অষ্ট বন্ধনের মধ্যে ও শাসনের তাড়নায় মরিয়া হইয়া ওঠে; হাতকড়ি বেড়ি জেলবন্ধ নির্জ্জন কুঠুরীর ব্যবস্থা এ সব তো তাহারা গ্রাহ্যই করে না, এমন কি বেত্রাঘাত সহ্য করা একটা বাহাদুরী বলিয়া মনে করে। অতি হীন লজ্জাকর পাপকার্য্যে ধরা পড়িয়া দণ্ডভোগ করিবার সময়ে তাহাদের মনের বল ও অকুতোভয় ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহারা দুই এক বৎসর সেলুলার জেলে দণ্ড ভোগ করিয়া সেটেলমেণ্টে মুক্তি পায়, কিন্তু আবার আসে। জেলে আসিবার জন্য হয় কাহাকেও মারে, নয় চুরী করে বা জুয়া খেলে অথবা পলাইয়া দু' চার দিন পর হাজির থাকিয়া শাস্তি পাইবার জন্য ধরা দেয়। বাহিরে বন বিভাগে, চা ও রবার বাগিচা বা ইটের পাঁজার কাজের অপেক্ষা সেলুলারের কলুর কাজও সহজ, সেলুলারে রৌদ্র বৃষ্টি ভোগ করিতে হয় না, এবং জেলে কয়েদীর রেসন (Ration) চুরি হয় না বলিয়া এখানে পেট ভরিয়া খাইতে পাওয়া যায়। আমি এক এক জন দাগীচোরকে দশ এগার বার জেলে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়াছি। সেরা, মুরগা, সৈয়দ, মহাবীর, পালোয়ান, গোর, চার্লি প্রভৃতি স্বনামধন্য দাগী চোরের (Jail bird) কুকীর্ত্তি জানে না এমন লোক পোর্ট ব্লেয়ারে নাই।

নিরীহ দুর্ব্বলচিত্ত কয়েদীর (Casual offender) অপরাধীর দলই শতকরা ৮০।৯০ জন। ইহারা গ্রহবৈগুণ্যে দুর্দ্দৈববশে জেলে আসে অতি

পাপে অনভ্যস্ত নিরীহ সরল সোজা মানুষ হইয়া, আর অনেক পোড় খাইয়া বার বার শাস্তি দুঃখ অভাব ভোগ করিয়া কলুষিতের সংস্পর্শে আসিয়া কয়েদী এখান হইতে ফিরিয়া যায় চতুর লোভী নির্দ্দয় ও কুক্রিয়াসক্ত হইয়া। যে যে কারণে সোজা নির্ম্মল মানুষ কারাজীবনে নষ্ট হয় তাহা মোটামুটি এই ঃ—

(১) দাগী পুরাণ চোরের সাহচর্য্য ও পাপবৃত্তির উপভোগ দর্শন।

(২) কঠিন কাজের অসামর্থ্য। যখন সে ত্রিশ পাউণ্ড তেল আর কিছুতেই পিশিয়া উঠিতে পারে না, তখন দণ্ডের ভয়ে সমর্থ বদমাইসের শরণ লয়, এবং তাহার পাপ প্রবৃত্তির ইন্ধন যোগাইয়া বিনিময়ে নিজের অর্দ্ধেক কাজ তাহাকে দিয়া করাইয়া লয়।

(৩) ভয় প্রদর্শন ও দণ্ডের তাড়নার উপর প্রতিষ্ঠিত এই (punitive) জেল বিধি পরোক্ষভাবে অধঃপতনের কারণ। প্রথম প্রথম হাত কড়ায় দাঁড়াইতে, বেড়ি পরিতে বা উলঙ্গ হইয়া বেত খাইতে প্রাণান্ত লজ্জা ও ভয় থাকে, কিন্তু একবার এ ভয় ও লজ্জা ভাঙ্গিয়া গেলে মানুষ মরিয়া হইয়া উঠে; একটা অন্ধ রাগে ঘৃণায় কঠিন হইয়া পাপের পথে যায়। ব্যর্থ ক্রোধে আত্মঘাতীর চিত্র জেলখানায় অতি সুলভ।

(৪) অভাবের তাড়না। আর একটি কারণ যাহার পূর্ব্বে তামাক বা কোন নেশার অভ্যাস ছিল, সে একটু তামাকের জন্য ক্রমশঃ না করিতে পারে এমন কুকর্ম্ম ইহ সংসারে নাই। দুই তিন বৎসর চিনি মাংস বা মিঠাই না খাইতে পাইয়া এক মুঠা চিনির জন্য মানুষকে আমি জঘন্য পাপ করিতে সচক্ষে দেখিয়াছি।

(৫) বাধ্যতা-মূলক কৌমারব্রত। মানুষের স্বাভাবিক ক্ষুধাকে আইনে চাপিয়া রাখা যায় না। স্ত্রী পুত্রের সহবাস হইতে বঞ্চিত স্নেহ ও সঙ্গসুখ ক্ষুধায় কাতর মানুষ যে কত বীভৎস উপায়ে বাসনার চরিতার্থতার জন্য জীবন কলঙ্কিত করে, তাহা পোর্ট ব্লেয়ার বা যে কোন জেলে কয়েদী হইয়া দেখিলেই

বুঝা যায়। পরিবারের স্নেহকোল (home influence) এবং আত্মতৃপ্তির অভাবে মানুষকে সত্য সত্যই পশু করিয়া তোলে।

(৬) ধর্ম্ম জীবন ও জ্ঞানের অভাব। জেলে পাপের পথে যাইবার সহস্রমুখী প্রেরণা আছে, কিন্তু জ্ঞানলাভ বা পরমার্থ ভাবের অনুপ্রাণণার কোন অনুষ্ঠানই নাই। কয়েদী যখন দেশে স্বাধীন ছিল, তখন তাহার মুক্ত জীবনে মন্দির বিগ্রহ গুরু পুরোহিত পূজা পার্ব্বণ সাধু বৈরাগী কথকতা এমনি কত চরিত্রগঠনের উপকরণই ছিল, এ সকল হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহার জীবন পাপের সংস্পর্শে আনিয়া জেলের কর্ত্তৃপক্ষ এই মন গুলির কোন্ পথ খুলিয়া দেন ?—স্বর্গের না নরকের ?

(৭) অধোগতির আর এক কারণ শুভের পথে প্রেরণা বা প্রলোভনের অভাব। দেশের জেলে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, অশন বসনের মিতব্যয়, সচ্চরিত্রতা, কোন সদনুষ্ঠান বা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত কাজ করিতে পারিলে মাফ (remission) পাওয়া যায়, তাহার ফলে কয়েদীর সাজার পরিমাণ মাসে মাসে দশ বার দিন করিয়া কমিতে থাকে। ভাল হইবার দিকে এ একটা প্রবল টান। পোর্ট ব্লেয়ারে এরূপ মাফ বা remission পাইবার ব্যবস্থা নাই। কেবল জুবিলি বা কোন রাজকীয় উৎসবে অসাধারণ মাফ দশ বছরে এক দুইবার মাত্র আছে।

(৮) আর এক কারণ এই, যে, সাজার কোন সীমা নাই ; পোর্ট ব্লেয়ারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিতের সাজার কাল আমৃত্যু—সত্য সত্যই আজীবন। তবে চিফ কমিসনারের একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে ; তদনুযায়ী খুনীর পক্ষ হইয়া ২০ বৎসর পর এবং ডাকাতি ও রাজবিদ্রোহের অপরাধীর পক্ষ হইয়া ২৫ বৎসর পর তিনি ভারত গভর্ণমেণ্টের কাছে এই মর্ম্মে আবেদন করিতে পারেন, যে, এ ব্যক্তি এ যাবৎ কাল নিরীহ ভাবে দিনপাত করিয়াছে, সুতরাং ইহার বাকি মেয়াদ মাফ করিয়া ইহাকে মুক্তি দেওয়া হউক। শতকরা বোধ হয় ১০

জনের আবেদন অগ্রাহ্য হইয়া এই উত্তর আসে, যে, সরকার বাহাদুর তাহাকে আরও পাঁচ বৎসর পর্য্যবেক্ষণাধীনে রাখিবেন। কোন কোন ক্ষেত্রে আবেদন আদৌ গ্রাহ্য হয় না এবং অপরাধীকে পোর্ট ব্লেয়ারে স্বাধীন অর্থাৎ ex-convict করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। শতকরা বাকি ৯০ জনের যে কয় জন পোর্ট ব্লেয়ারে জল হাওয়ার প্রাণঘাতী প্রভাব এড়াইয়া এই দুঃখে মনস্তাপে, এই পাপের দূষিত জীবন বহন করিয়া বাঁচিয়া থাকে তাহারা মুক্তি পায়। বিশ বা পঁচিশ বৎসর পরের এই সুদূর পরাহত আশার আলেয়া দেখিয়া কয়জন জীবন ধরিতে পারে? তদুপরি বহুতর কয়েদীর দুই তিনটি অবধি আজীবন-মেয়াদ (life-sentence) আছে, সুতরাং তাহাদের সাজার পরিমাণ ৪০ বা ৬০ বৎসর। কাহারও কাহারও ৭৫ হইতে ১০০ বৎসর অবধি মেয়াদ হইতেও দেখিয়াছি। যাহার জীবনে আশার আলো এমন করিয়া নিবিয়াছে, তাহার অকার্য্য বা দুঃসাধ্য কি আছে? পোর্ট ব্লেয়ারে যত খুন ডাকাতি জেল পলায়ন ও নৈতিক পাপাচারের কুমতি এই নৈরাশ্য ও বিফলতা হইতেই আসে।

(৯) যতগুলি অধঃপতনের কারণ দর্শাইলাম তদুপরি যদি জেলের জেলার ওভারসিয়ার ও উপরিতন কর্ম্মচারীরা নির্ম্মম ও হৃদয়হীন হয়, তাহা হইলে জেল সাক্ষাৎ নরকে পরিণত হইতে অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি আর থাকে না। হৃদয়হীন হওয়া দূরে থাক, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শুধু অবিবেচক বা আলস্য-পরায়ণ বলিয়া কর্ত্তব্যবিমুখ হইলেই সর্ব্বনাশ! পশুপ্রকৃতি পেটি অফিসার, টিণ্ডাল ও জমাদার উপরওয়ালার সেই দুর্ব্বলতার সুবিধা পাইয়া কয়েদীর জীবন দুর্ব্বহ করিয়া তোলে।

(১০) তাহার উপর পোর্ট ব্লেয়ার রোগের আলয়; ম্যালেরিয়া, উদরাময়, আমাশয়, যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া ও টাইফয়েড এখানে অবাধে রাজ্য করিতেছে। রৌদ্রে জলে অবিশ্রান্ত কঠিন পরিশ্রমে আনন্দহীন জীবন বহিয়া

বহিয়া মানুষের শ্রান্ত মন অবসাদে ভাঙ্গিয়া গিয়া মরণপণ করিয়া বসে অথবা বিদ্রোহী হইয়া পড়ে। এখানে যে একবার মরিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে, তাহাকে বাঁচান দুষ্কর; কারণ এস্থানের পারিপার্শ্বিক সকল অবস্থাই মানুষকে সর্ব্বদা মরণের পথেই টানিতে ব্যস্ত, বাঁচিয়া যে থাকিতে হয় তাহা একরকম প্রাণপণ করিয়া অনেক কষ্টেই; যমে মানুষে এখানে নিত্যই টানানানি লাগিয়া আছে।

(১১) অধিকন্তু দুর্নীতি পাপ দীনতাভরা এই কলুষের বাতাসে একবার চরিত্র মলিন হইলে কদর্য্যরোগে শরীর শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যায়। এ সব রোগ এখানে কত যে বেশি এবং তাহা কি ভয়াবহ রূপই যে ধরিয়াছে, তাহা বলিবার নয়। কয়েদীর এ রোগ ধরা পড়িলে শাস্তি হয়, তাই শেষ পর্য্যন্ত যথাসাধ্য তাহারা এ রোগের আক্রমন গোপন রাখে। সতীত্ব বলিয়া নারীর বা পুরুষের চরিত্র বলিয়া কোন বস্তুই এদেশে নাই, রিপুর নৃত্য এ নরকে একেবারে উলঙ্গ ও পৈশাচী।

দশম পরিচ্ছেদ।

কয়েদীর জীবনের গুটিকত চিত্র।

কয়েদী-চরিত্র এইরূপ নানা পঙ্কিল স্রোতে পড়িয়া আশা ভরসা হারাইয়া কত যে অদ্ভুত রূপ ধারণ করে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। উপর্য্যুপরি শাস্তিতে নৈরাশ্যে কেহ কেহ ঘোরতর রুক্ষ মেজাজ ও cynic হইয়া পড়ে; মহাবীর ও সৈয়দ ছিল ইহার দৃষ্টান্ত। আমরা যখন মহাবীরকে দেখি তখন তাহার বার ছয় সাত বেত্রাঘাত হইয়া গিয়াছে; হাতকড়ি, বেড়ি, ক্রশবার ও অর্দ্ধাহারের (penal diet) হিসাব কিতাব ছিল না। মহাবীর দীর্ঘাকার রোগা, কদাকার, ভূর্দ্ধাসা মূর্ত্তি! অশ্লীল গালি তাহার মুখে লাগিয়াই আছে; দিবারাত্র বিড় বিড় বিড় বিড় করিতেছেই; প্রচলিত গালিতে রাগের শান্তি হয় না দেখিয়া অগত্যা তাহাকে মৌলিক গালির সৃষ্টি করিতে হইত। মারে সাহেব বেঁটে বক্কর বলিয়া মহাবীর তাঁহার নাম দিয়াছিল "বটেরিয়া" (বটের এক রকম ছোট্ট পাখী)। আর ব্যারী সাহেবের ছিল প্রায় মহাবীরের দেওয়া এক শ' আট নাম। সে সব অভিনব অকথ্য কুকথা পুণ্যনাম মহাবীর প্রাতঃসন্ধ্যা মুখ ভেঙাইয়া মনের সুখে পাঠ করিত। তাহার বদ্ধমূল ধারণা ছিল, যে, ঐ একই কচুপাতার তরকারী নিত্য খাইয়া খাইয়া ত্রিশ বৎসরের খোরাক তাহার পেটে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে, তাই তাহার ধাত এত কসা এবং সেই জন্য তাহার এই ঘোরতর অগ্নিমান্দ্য। এক বিড়া তামাকের জন্য মহাবীর যাহার তাহার খোসামোদ করিত; 'না ভূত না ভবিষ্যতি' করিয়া গালি পাড়িত; তাহাকে এরূপ দুর্দ্দশায় ফেলিয়াছে বলিয়া ভগবানের উর্দ্ধতম চতুর্দ্দশ পুরুষ অবধি উদ্ধার করিয়া ছাড়িত। কোন অফিসার বা দর্শক জেল

পরিদর্শন করিতে আসিলে আর কেহ অনুযোগ অভিযোগ করুক না করুক মহাবীরের কাতরণি অবিশ্রাম চলিবেই, সে সনাতন অভিযোগের প্রতিকার না করিলে তাহার পর অকথ্য অশ্রাব্য ভাষায় আশীর্ব্বাদ ত আছেই।

সৈয়দ বৃদ্ধ শ্বেত-শ্মশ্রু রক্তচক্ষু দীর্ঘাকার পুরুষ, অশ্লীলভাষী; তোষামোদ করিতে যেমন ওস্তাদ, গালি পাড়িতে ও কোন্দল করিতে ততোধিক মহাবীরের সমস্ত গুণই তাহার শরীরে বর্ত্তমান, তদুপরি সে কখন কখন মিষ্ট ভাষী ও ফুর্ত্তিবাজ। কিছু তামাক পাইলে ঠেলিয়া বাহির করা চক্ষু লইয়া লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া উদ্ভট অঙ্গভঙ্গির সহিত দু' চার হাত গদ্‌কার (ছোট লাঠি) পাঁয়তাড়া দেখাইয়া দিবে। "বোম্ কালী কলকত্তেওয়ালী" বলিয়া সৈয়দ মাঝে মাঝে ভীম চীৎকার ছাড়িত, কখন কখন নিজের দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া অধীর হইলে তার স্বরে গালি দিয়া জেল মাথায় করিত। নানাপ্রকার সুখাদ্য খাইবার লোভ ছিল তাহার প্রচণ্ড; এক নিঃশ্বাসে সে পোলাও, জরদা, মুতঞ্জন্, কাবাব, কোপ্তা, মোতিচুর ইত্যাদি অগণ্য লেহ্য পেয়ের নাম করিয়া যাইত; লম্ফ ঝম্প করিয়া বলিত, "সৈয়দ এই সব খানেওয়ালা, তার কপালে শেষটা কিনা ভূঁইয়া পাত্তি (কচুপাতা) ও অড়রের ডাল! তোবা তোবা!! ইয়া বিস্‌মিল্লা ইয়া খোদাওয়ন্দ্ করীম্!!!" রাত্রে যে ব্লকে সৈয়দ শয়ন করিত, সে নম্বরে কাহারও নিদ্রায় চক্ষের দুই পাতা এক করিবার জোটি নাই; যতক্ষণ না কেহ রাত্রের খোরাক তামাক বা খৈনী দিবে, তত ক্ষণ বন্ধ দরজায় বসিয়া গালি পাড়িবে, আর ক্ষণে ক্ষণে ডাকাত পড়া কসমের হাঁক ছাড়িবে, "এ-এ-এ সিল্‌ওয়ার্ জানিয়া রে-এ-এ (সেলুলার জান বা প্রেয়সী), এ-এ-এ বারিয়া ভঙ্গি (ব্যারী মেথর), খোদা তেরা বেড়া গরখ করে (ভগবান তোর ভরাডুবী করুক)।" সৈয়দকে রাত্রে পার্শ্বের কুঠরীতে শুইতে দিবার মত মানুষ ক্ষেপাইবার এমন সহজ উপায় আর নাই। তিক্ত বিরক্ত হইয়া প্রাণের দায়ে লাইনের চার জন ওয়াডার বা কুঠরীর কোন ধনী

(তাম্রকুট ধনে ধনী) কয়েদী এক বিড়া শুখা পাঠাইলে তবে সকলের সে রাত্রের মত নিস্তার হইত। কখন কখন সে চিৎকার করিলেই জেলারের হুকুমে টিনের মগে করিয়া তাহার উপর জল ফেলা হইত। স্বভাব দোষে সৈয়দ নিজেও জ্বলিয়া মরিত, আর জেলশুদ্ধ লোককে জ্বালাইত। অবশেষে মারে সাহেব কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে পাগলা গারদের বাগানে পাহারাওয়ালার কাজ দিয়া জেল হইতে মুক্তি দেন; দয়া পাইয়া এখন নাকি সে আর গালি পাড়ে না।

মুরগা আর এক জন কালাপানি-বিখ্যাত জীব। তাহার চেহারা ছিল কলির ভীমসেন প্যাটার্ণের—কালো ভূতো লোমশ বৃষস্কন্ধ পুরুষ; বিরাট গোঁফে তোফা এক গাছি ঝাঁটা তৈয়ার হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। এক ডাব্বু কালতু দধি বা গোটা কয়েক কদলীর লোভ দেখাইয়া ব্যারী সাহেব তাহাকে হাত ঘানিতে জুতিয়া দিতেন, আর মুরগা ও তাহার জুড়িদার সেরা প্রতি জনে সারা দিনে আশী পাউণ্ড তেল পিষিত। সেলুলার জেলে প্রথমে কয়েদীর বিশ পাউণ্ড তেল বরাদ্দ ছিল, ব্যারী সাহেবও এই দুই ভাড়াটিয়া গুণ্ডার ষড়যন্ত্রে আজ কাল ঘানীর কাজ ৩০ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যখন দেখিলেন এক জন মানুষ অক্লেশে ৮০ পাউণ্ড পিষিয়া ফেলিল, তখন এক জন মসক্কতি (মজুর) ৩০ পাউণ্ড অবশ্যই পিষিবে। ধড়িবাজ ব্যারী সাহেব জেলের প্রত্যেক কাজ বা মসক্কৎ এই উপায়ে বৃদ্ধি করিয়াছেন, সেলুলারে আজ কাল আর কয়েদীর সে পূর্ব্বকার রামরাজ্য নাই।

দুই তিন জন ১৬।১৭ বৎসরের বর্ম্মা জেলে দেখিয়াছিলাম। বর্ম্মারা এখানে অত্যন্ত কলুষিতচরিত্র, আফিংখোর ও জুয়াড়ী হয়। তাহার মধ্যে টোয়া, ফোঁয়া ও আর একটি সচ্চরিত্র ছিল। কিন্তু হইলে কি হইবে, বৎসরে এক আধটা খুন তাহাদিগকে করিতেই হয়। পাঠান ও পাঞ্জাবীরা বড় পশু-

প্রকৃতির, সুদর্শন তরুণ বর্ম্মা দেখিলে তাহারা তাহার পিছু লাগে। পাপে প্রবৃত্ত না হইলে পেটি অফিসার বা জমাদারের যোগে মোকদ্দমা (case) বাধাইয়া তাহাদের শাস্তি দিয়া বিব্রত করিয়া তোলে। কয়েদীর কাছে লুকান তামাক বা দু' একটা ফালতু নিয়মবিরুদ্ধ (contraband) জিনিস থাকেই, তাহা ধরাইয়া দিলেই শাস্তি। দিনের বরাদ্দ কাজ চুরি করিয়া লইয়া বিপন্ন করিলেও শাস্তি অনিবার্য্য। মিছামিছি মার পিটের বা গালি গালাজের মোকদ্দমা গড়িয়া আসামীকে সাহেবের সামনে খাড়া করিয়া দিতে পারিলেই হাকিম চক্ষু মুদিয়া শিকার গিলিয়া ফেলেন। এক বারে সাহেবকে কতকটা সুবিচারের চেষ্টা করিতে দেখিয়াছি। নহিলে অনাহারী ম্যাজিষ্টরী আদালতের পাঁটা জবাই গোছের বিচার হয় আর কি! ফোঁয়া কয়েকবার খুনের দায়ে পড়ে, শেষে আমরা তাহাকে প্রেসে আনিয়া কাগজ কাটাইয়ের কাজে দিই। সেখানে সদ্ব্যবহার পাইয়া নির্ব্বিবাদে সে বিনা মোকদ্দমায় দেড় বৎসর কাটাইয়া জেল হইতে মুক্তি পায়। বাহিরে এখন তাহার অদৃষ্টে কি আছে ভগবানই জানেন।

কাত্তিকে মুচি ডাকাত। মনে অসীম বল, শরীরে শক্তি ও উৎসাহ, কাজেই লাঠিবাজীর জোরে সখের ডাকাতি করিত। মানুষটি অন্যান্য হিসাবে অতি সুন্দর প্রকৃতির, যাহাকে ভাল বাসিবে তাহার প্রাণপাত করিয়া সেবা করিবে। এক দিন উপেন তাহাকে হিন্দু-মুসলমান প্রীতির সম্বন্ধে এক লম্বা মামুলী বক্তৃতা শুনাইল, উপদেশের বন্যা মাথা পাতিয়া লইয়া কার্ত্তিক দিব্য হুঁ দিয়া গেল, তাহার পর কথা শেষ হইলে বলিল, "বাবাঠাকুর, আপনি যা নিবেদন কল্লে তা খাঁটী কথা। কিন্তু বাবাঠাকুর, এমন যে মধুর হরিনাম তা যখন এরা মুখে আনলে না, তখন এদের গতি কি হবে, আপনি বল দেখি?"

তাহাকে 'কাত্তিকে' না বলিয়া 'কার্ত্তিকচন্দ্র' বলিলে তাহার মনঃপুত হইত না। তাহার বাবাঠাকুরের জন্য সে না করিতে পারিত এমন কাজ ছিল না।

হেমদা' জঙ্গলে গেলে কার্ত্তিক তাঁর বড় সেবা যত্ন করিয়াছিল। মাছ ধরিতে কার্ত্তিক ছিল অদ্বিতীয়।

এখানে মানুষের মধ্যে স্নেহ ভালবাসা সবই আছে, কিন্তু বড় বিকৃতভাবে। এক জনের জন্য অপর এক জনকে জীবন দিতে কঠিন স্বার্থত্যাগ করিতে নিত্য দেখা যায়, কিন্তু সে ত্যাগ, সে প্রেম কলুষের পঙ্কে পঙ্কিল।

অতিশয় সাধু প্রকৃতির লোকও এখানে আছে। মথুরা সিং পেটি অফিসার হইতে ক্রমশঃ টিণ্ডাল অবধি হইয়া ১০।১২ বৎসর জেলে কাজ করে। এমন সাত্ত্বিক প্রকৃতির নিরীহ মানুষ নিতান্ত কম দেখা যায়। মথুরা সিংএর মুখে অশ্লিল গালি কখন শুনি নাই, এই তুর্ব্বার পাপের রাজ্যে কোন পাপই তাহার শরীরে নাই। বিরাট বিরাশী সিক্কা ওজনের একটা চড় তুলিয়া মথুরা কিন্তু মারিবার সময়ে এক রকম যাদুর গায়ে হাত বুলাইয়াই কাজ সারে, তাহার তর্জ্জন গর্জ্জন সব শরতের মেঘের নিষ্ফল আয়োজন। কয়েদীর প্রতি তাহার অপার করুণা; সাহেব কখন কি বলিবে সেই ভয়ে সে সদা তটস্থ ও বিস্ফারিত-চক্ষু; নিত্য তুলসীদাসী রামায়ণ পাঠ না করিলে তাহার অন্নজল মুখে রুচে না। সে নিতান্তই Goody Goody ধরণের গো-বেচারা ভাল মানুষ। ইহাকে জেলে ধরিয়া রাখা আর গো-বধ করা একই কথা। মথুরা এখন টিকিটে আছে। অর্থাৎ কতকটা স্বাধীনভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবার অধিকার পাইয়াছে।

সেলুলার জেলের দ্বারী বা গেট কিপারের (Gate-keeper) নাম তকৎ সিং, বাড়ী সগরে। লোকটি ইংরাজি সামান্য জানিলেও উচ্চশিক্ষিত, দেশের বা জগতের কঠিন কঠিন আধুনিক সমস্যার কথাও বোঝে। তাহার ভৃত্য বা মজুর জমিজমা সংক্রান্ত মামলায় কাহাকে খুন করায় তাহার দ্বীপান্তর হইয়াছে, অথচ এই সাধুপ্রকৃতি সদ্বংশজাত ভদ্রসন্তানের উপর ক্রমশঃ দুঃখ দৈন্যের প্রভাব আসিয়া পড়িতেছে। মানুষকে শাস্তি দিয়া বড় করা যায় না;

মুখ বাঁধিয়া ভাল্লুককে নাচাইতে পার বটে, কিন্তু সে পশুই থাকিয়া যায়। শাস্তির নাম করিয়া সৎ স্বভাবের মনকে কলুষের আলয়ে আনিয়া বিকৃত করার অপরাধ খুনের অপরাধের চেয়েও জঘন্য। আমাদের পেনালকোড মারমুখী, সমস্তই পিউনিটিভ (punitive) ব্যবস্থা; প্রবৃত্তির বশে বা হঠাৎ উত্তেজনায় যে খুন বা পীড়ন করিয়া ফেলে, তাহার জন্য যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, লঘুপাপে গুরুদণ্ড। আমেরিকার বিচারক শাস্তি দিবার সময় অপরাধীর মানসিক (intellectual) বিকাশের তারতম্য ওজন করিয়া দেখেন। এক জন লোকের বয়স চল্লিশ বৎসর হইতে পারে, কিন্তু তাহার জ্ঞান (intellectual stature) হয়ত দশ বৎসরের বালকের তুল্য; এ অবস্থায় তাহার অপরাধের শাস্তিও তদনুরূপ হওয়া উচিত। অধিকন্তু বিকৃত চরিত্রের ভার লওয়া বড় বিষম দায়িত্ব; যদি তাহার নষ্ট মনুষ্যত্ব তাহাকে ফিরাইয়া না দিলাম, তবে তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অপহরণ করিবার আমার কি অধিকার আছে? এই সব বিষয় চিন্তা করিয়া নূতন করিয়া কারা-বিধি প্রণয়নের দিন আসিয়াছে। ভারত ও ইংলণ্ড আজও এ বিষয়ে বড় পশ্চাদপদ।

এই সকল অপরিণতমন অপরাধীর ভার উন্নতমনা দয়ার্দ্র সুশিক্ষিত লোকের হাতে দেওয়া দরকার। আন্দামানে তাহা তো হয়ই না, অধিকন্তু তাহার বিপরীত হয়। যে কয়েদীরা খুব চালাক ও সাবধানী, তাহারা শত অপরাধ করিলেও সহজে ধরা পড়ে না, সুতরাং তাহাদের জেল-টিকিট সাফ থাকে অর্থাৎ কোন কেস বা মোকদ্দমা না হওয়ায় টিকিটে দাগ পড়ে না। সচরাচর এই প্রকার কয়েদীরাই পেটি অফিসার, টিণ্ডাল বা জমাদারের পদ লাভ করে, দ্বিপদ পদবৃদ্ধি হইয়া চতুষ্পদ হয় আর কি! সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কয়েদীকে প্রমোশন দিবার সময় তাহার প্রকৃত চরিত্রের দিকে লক্ষ্য রাখেন না, কেবল দেখেন তাহার জেল-টিকিটে (Jail History Sheet) কোন কেস বা অপরাধের জন্য সাজা আছে কি না।

মিরজা খাঁ ছিল জাতিতে পাঠান। এ জীবনে অনেক ঘাটের জল খাইয়া অনেক দেশ ঘুরিয়াছি, মিরজা খাঁর মত চতুর লোক আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি। পেটি অফিসার হইতে অবশেষে সে জমাদার হইয়া দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বহু বৎসর সেলুলারে রাজত্ব করে। শয়তানী ও পাপাচারে গোলাম রসুল তাহার কাছে অজ্ঞান শিশু, মিরজাকে আরও দশ বৎসর গুরু করিয়া সাগরেতি করিলেও রসুল চাচা এই রক্তশ্মশ্রু রক্তমুখ মিষ্টভাষী পাঠানের সমকক্ষ হইতে পারে কিনা সন্দেহ। মিরজা খাঁ সায়েস্তা না করিতে পারিত এমন দুর্দ্দান্ত কয়েদী যদি আন্দামানে ছিল তো কচিৎ দু' একটাই ছিল। "রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে ?" এ কথা মিরজার আমলে মিরজার পক্ষে হুবহু খাটিত। মিরজা নিজ ক্ষুরধার বুদ্ধির জোরে ও তোষামোদে ব্যারী সাহেবকে মুঠার মধ্যে রাখিয়া হাতে মাথা কাটিত তাহার রাজত্বে পাঠান ছিল সুখী, আর মিরজার পদানত কয়েদী ছিল সুখী; অবশিষ্টের ছিল দুঃসহ নরকবাস। ব্যারী সাহেবের ইঙ্গিত পাইলে বা নিজের প্রতিশোধের কামনায় মিরজা নিতান্ত নিরীহের নামে দেখিতে দেখিতে মোকদ্দমা গড়িত, বার বার শাস্তি ভোগ করাইয়া, মারিয়া, উত্যক্ত করিয়া অতি দুর্দ্দান্ত দুঃসাহসী কয়েদীকেও উদ্বাস্ত করিত। সে শক্তের ছিল বন্ধু, নরমের ছিল যম। রাজনীতিক বন্দীদের গুপ্ত চিঠি পত্র ধরিয়া নানা তুচ্ছ আইন কানুন ঘটিত (Technical) অপরাধে তাহাদিগকে সাজা খাওয়াইয়া মিরজা জমাদারী পাইয়াছিল। যাহার সহিত সে হাসিয়া "বাবুজী" বলিয়া বন্ধুত্ব করিতে আসিত, তাহার সর্ব্বনাশ আর কি! কখন যে গলায় ছুরি দিবে তাহার জন্য সকলকে সদা সচকিত থাকিতে হইত।

যাহারা দুর্দ্দান্ত ও উৎপীড়ক (bully) হয়, তাহারা সচরাচর তোষামোদের দাস। মিরজার হাত হইতে বাঁচিবার পন্থা ছিল তাহাকে স্মিতমুখে

"জমাদার জী" বলিয়া মুহুর্মুহুঃ সেলাম করা এবং তাহাকে দেখাইয়া ব্যারী সাহেবের সহিত রসালাপ করা। সাহেব যাহার সহিত একবার কথা বলিয়াছে, তাহার সাত খুন মাপ। আর একটা উপায় ছিল মিরজার উপর প্রখর দৃষ্টি রাখা; সে বড় দুশ্চরিত্র ও ঘুসখোর ছিল, যদি সে বুঝিত অমুক তাহার পদস্খলনের খবর রাখে তাহা হইলে সে পারতপক্ষে শত্রুকে ঘাঁটাইত না! "আমি যে তোমার দুরভিসন্ধির কথা জানি" এই প্রকার একটু ইঙ্গিত একবার দিলেই মিরজা নয় লেবু নয় কয়েক পাতা তামাক উৎকোচ লইয়া উপস্থিত!

টিণ্ডাল পেটি অফিসার জমাদার ও ওয়াডারের মধ্যে কত যে এই প্রকার ছিদ্রান্বেষী মারমুখী উৎপীড়ক আছে, তাহার হিসাব করা কঠিন। ভালমন্দ নানা উপায়ে এই সপ্তরথীর হাত হইতে কয়েদীকে সদা আত্মরক্ষা করিতে তটস্থ থাকিতে হইত। এখানে নিত্যই "প্রাণ রাখিতে রাখিতে প্রাণান্ত," দিবারাত্র দন্ত বাহির করিয়া "আইয়ে সাহেব" "যাইয়ে হুজুর" করিতেই জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা চিফ কমিশনারের মত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী কয়েদীর এ সব দৈনন্দিন দুঃখ দুর্দ্দশার কথা জানেন না, কারণ তাঁহারা কখন কখন পরিদর্শনে আসেন, কয়েদীর সহিত নিত্য বসবাস করেন না। ওভারসিয়ার বা ঐরূপ নিম্ন কর্ম্মচারীরা অনেক কথা জানে, কিন্তু তাহাদেরও তো কুলের কথা আছে। তাহারা কয়েদীর জানিত নিজের চুরি বা আইনভঙ্গের দোষ ত্রুটি ঢাকিতে চক্ষু মুদিয়া থাকেন, যাহাতে অসুবিধা হয় তেমন কিছু দেখিয়াও কখন দেখিতে পান না। ডগন সাহেবের মত দু' এক জন কল্যাণকামী নিম্নপদস্থ কর্ম্মকর্ত্তা একা কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না বলিয়া অগত্যা নিশ্চেষ্ট থাকেন; যে সব মোকর্দ্দমা নিজের হাতে পড়ে তাহারই কূল কিনারা করিয়া নিরীহের যথাসাধ্য প্রাণরক্ষা ও দুর্ব্বৃত্তকে ধমক চমক করিয়া নিজের সুমতি ঠাকুরাণীর মন যোগান।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দুঃখের সার-সঙ্কলন।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ভারত গবর্ণমেণ্ট নিয়োজিত জেল-কমিশন পোর্ট ব্লেয়ার পরিদর্শন করিতে আসেন। রাজনৈতিক কয়েদীদিগের পক্ষ হইতে তাঁহাদের নিকট যে প্রার্থনা-পত্র প্রেরিত হয় নিম্নে আমরা তাহার সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।—

১। পোর্ট ব্লেয়ার নানাকারণে কয়েদীর বাসস্থান হইবার উপযুক্ত নহে; (ক) এখানকার জলবায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, ম্যালেরিয়ার ইহা পীঠস্থান; এতদ্ভিন্ন রক্ত-আমাশয় ও যক্ষ্মারোগীর সংখ্যাও যথেষ্ট। এখানে মৃত্যুর হার ভারতবর্ষের মৃত্যুর হার অপেক্ষা দ্বিগুণেরও অধিক। (খ) অন্য কোনও সভ্যদেশে কয়েদীর জন্য এরূপ নির্ব্বাসন ব্যবস্থা নাই। সরকারী বা বেসরকারী কোনও পরিদর্শক সাধারণতঃ এখানে আসেন না; সুতরাং দেশের জেলে অত্যাচার অবিচারের যেরূপ প্রতীকারের ব্যবস্থা আছে এখানে তাহার সম্পূর্ণ অভাব। (গ) পোর্ট ব্লেয়ারের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। অল্পসংখ্যক কয়েদীর জন্য যেরূপ পুলিস প্রহরী, পল্টন, ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হয়, তাহাতে পোর্ট ব্লেয়ারের খরচ ভারত গবর্ণমেণ্টকে চিরদিনই বোঝার মত বহিতে হইবে।

২। কয়েদীর চরিত্র সংশোধনই যদি দণ্ডনীতির উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে পোর্ট ব্লেয়ারে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। এখানে আসিবার পূর্ব্বে লোকে যেরূপ দুর্নীতিপরায়ণ থাকে, এখানে আসিয়া

তাহার শতগুণ হইয়া উঠে। এখানে শাসন এমনি ব্যাপার যে প্রাণ বাঁচাইবার জন্যই লোককে মিথ্যা কথা ও প্রবঞ্চনা শিখিতে হয়। তাহার উপর সকলেই নিজেকে লইয়া ব্যস্ত; কেহ কাহাকে সাহায্য করিলে দণ্ডিত হইতে হয়, সুতরাং মানুষের সদ্‌বৃত্তিগুলি একেবারে নিস্তেজ হইয়া যায়। অন্যান্য দেশে কয়েদীকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিবার চেষ্টা হয়; এখানে তাহার সম্পূর্ণ অভাব। এখানে এখন যে প্রথা প্রচলিত, তাহা পূর্ব্বকালের দাস-ব্যবসায়েরই রূপান্তর মাত্র।

৩। কয়েদীদের মধ্যে কার্য্যতঃ কোনরূপ শ্রেণীগত পার্থক্য স্বীকার করা হয় না। যাহারা লঘু অপরাধে অপরাধী তাহাদিগকে পুরাণ চোর ও পাষণ্ডদিগের সহিত একত্র বসবাস করিতে হয়। ফলে সঙ্গদোষে তাহাদের চরিত্রও বিকৃত হইয়া উঠে।

৪। সাধারণ মানুষ গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের ফলে চরিত্রবান হইয়া উঠে। কয়েদীরা সে সমস্ত গার্হস্থ্য ও সামাজিক প্রভাব হইতে বঞ্চিত। বৎসরে একবারের অধিক তাহারা বাড়ীতে চিঠিও লিখিতে পায় না; স্নেহ মমতাদি সদ্‌বৃত্তি তাহাদের মনে শুকাইয়া যায়। ভবিষ্যতে মুক্তি পাইবার আশাও তাহাদের মনে বিশেষ প্রবল নহে। যাহারা যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনে দণ্ডিত তাহারা অনেক সময় ২০।২৫ বৎসর পরেও মুক্তি পায় না। যাহাদের ভবিষ্যৎ এরূপ অন্ধকারময় তাহারা যে দিন দিন আশা উৎসাহহীন যন্ত্রবৎ জীবন পরিচালনা করিবে, অথবা নিষ্ঠুর ও স্বার্থান্ধ হইয়া উঠিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

৫। তাহারা যে ক্রীতদাসের মত কঠোর পরিশ্রম করে, তাহার ফল-ভাগী তাহারা হয় না। একজন লোক যদি আর একজনকে হত্যা করে, তাহা হইলে সরকার বাহাদুর হত্যাকারীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া কঠোর পরিশ্রম করাইয়া লন। কিন্তু হত্যাকারী বা হতব্যক্তির পরিবারবর্গ

সে পরিশ্রমের কণামাত্রও ফলভাগী হন না। তাহাদের সন্তানেরা হয় ত অর্থাভাবে অশিক্ষিত রহিয়া যায়; শেষে হয়ত দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠে। তাহাদের প্রতি যে কোনও কর্ত্তব্য আছে এ কথা গভর্ণমেন্ট স্বীকার করেন না, অথচ কয়েদীর পরিশ্রমলব্ধ অর্থ যে কি অধিকারে তাঁহারা আত্মসাৎ করেন তাহা বুঝা কঠিন।

৬। কয়েদীদের দ্বারা যে সমস্ত পরিশ্রম করাইয়া লওয়া হয় তাহাদের মধ্যে জঙ্গলে কাঠ কাটা, রবারের কাজ, ইট ও চুণ প্রস্তুত করা বাস্তবিকই এত কঠিন যে কয়েদীরা কাজের ভয়ে অনেক সময় জঙ্গলে পলাইয়া যায় এবং দেশে প্রত্যাগমনে অকৃতকার্য্য হইয়া অনেক সময় আত্মহত্যা করে। বিশেষতঃ পেটি অফিসার (petty officer) টিণ্ডাল (tindal) প্রভৃতি ছোট ছোট কর্ম্মচারিগণ যেরূপ ঘুসখোর ও অত্যাচারী তাহাতে তাহাদের হাতে পড়িয়া সাধারণ কয়েদীকে নানা প্রকারে উৎপীড়িত হইতে ও মিথ্যা সাজা খাইতে হয়। এ সমস্ত অত্যাচারের প্রতীকার হওয়া একরূপ অসম্ভব।

৭। কয়েদীর জন্য চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত আদৌ নাই। একে ত কাজ কর্ম্মের খাতিরে রোগীকে অনেক সময় হাঁসপাতালে স্থান দেওয়াই হয় না। তাহার উপর ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থাও ভাল নহে। জেলের হাঁসপাতালে অনেক সময় যক্ষ্মারোগী থাকে; কিন্তু তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ (ward) নাই; রক্তআমাশয় রোগীর পক্ষেও সেই কথাই খাটে। অস্ত্র চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে। জেলে প্রায় ৮০০ কয়েদীর স্বাস্থ্য পরিদর্শনের ভার ১ জন সব-আসিটাণ্ট-সার্জ্জনের উপর ন্যস্ত। হাঁসপাতালে রোগী দেখিয়া তিনি আর জেলের মধ্যে আসিয়া কয়েদীদের অবস্থা পরিদর্শন করিতে সময় পান না। যিনি মেডিকাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তিনি সপ্তাহে ২।৩ বার মাত্র জেল দেখিতে আসেন, কেননা পোর্ট ব্লেয়ারের অন্যান্য হাঁসপাতাল ও

মেয়েদের জেল দেখিবার ভারও তাঁহার উপর। একজনের উপর এত কাজ চাপান হইয়াছে যে কোনও কাজই ভাল করিয়া করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

৮। দশ বৎসর পরে কয়েদীদের বিবাহ করিবার ব্যবস্থা আছে। তখন কৃষিকর্ম্ম বা অন্য কোনও ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া তাহারা গ্রামে গিয়া বাস করিতে পারে। কিন্তু পুরুষের সহিত তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা এত কম যে অধিকাংশের ভাগ্যেই বিবাহাদি করিবার সুবিধা ঘটিয়া উঠে না। যাহারা বিবাহিত অবস্থায় দ্বীপান্তরিত হইয়াছিল তাহাদের স্ত্রীপুত্রও অনেক সময় পোর্ট ব্লেয়ারে আসিয়া তাহাদের সহিত বাস করিতে স্বীকৃত হয় না। আর যে শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা কয়েদী হইয়া জেলখানায় যায় তাহাদের লইয়া ঘর সংসার বাঁধিতে অনেক কয়েদীও রাজী নহে। কয়েদীর সহিত কয়েদীর বিবাহের ফলে পোর্ট ব্লেয়ারে যে অভিনব জাতির সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের সামাজিক ও পারিবারিক নীতিজ্ঞান নিতান্তই বীভৎস। কয়েদীরা যাহাতে অল্পদিন পরেই স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করিতে পারে এরূপ ব্যবস্থা না করিলে এ রোগের প্রতীকার হইবার উপায় নাই।

৯। যাহারা ১০ বৎসর পরে সরকারী চাকরীতে ভর্ত্তি হয় (self-supporters in Government service) তাহাদিগকে প্রথমে মাসিক ৭ টাকা মাত্র বেতন দেওয়া হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে আবার সরকারী বারাকে (Barrack) থাকার জন্য মাসে আট আনা কাটিয়া লওয়া হয়। বাকি ৬॥০ হইতে আহার, বস্ত্র ও সর্ব্ববিধ বিষয়ের ব্যয় নির্ব্বাহিত করিতে হয়। এরূপ স্থলে যে তাহারা প্রাণ ধারণের জন্য চুরি চামারী করে তাহা বলাই বাহুল্য। চুরি ধরা পড়িলে অবশ্য তাহাদের সাজা পাইতে হয় কিন্তু তাহাদের সে পাপের জন্য যথার্থ দায়ী কে? বহু পূর্ব্বে কয়েদীদিগের এই বেতনের হার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; তাহার পর সব জিনিসের দর অন্ততঃ তিনগুণ বাড়িয়া গিয়াছে;

কিন্তু কয়েদীদের কথা কেহ মনের কোণেও আনেন না। তাহারা শুধু সরকারী কাজ করিবার যন্ত্র মাত্র; মানুষ নহে।

১০। ১৭।১৮ হইতে ২০।২২ বৎসর বয়স্ক ছেলেদের সংখ্যা পোর্ট ব্লেয়ারে নিতান্ত কম নয়। যে সমস্ত কয়েদী পেটি অফিসার ও টিণ্ডেলের অধীনে তাহাদের রাখা হয় তাহারা সকলেই অবিবাহিত ও প্রায় সকলেই অসচ্চরিত্র। সুতরাং তাহাদের হাতে পড়িয়া এই সমস্ত ছেলেদের যে পাশবিক অত্যাচার সহ্য করিতে হয় তাহা আর ভদ্রভাষায় বর্ণনা করা চলে না। লজ্জায় তাহারা কর্তৃপক্ষের নিকট অনেক সময় নালিশও করে না; আর করিলেও অধিকাংশ সময়ই বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না।

এ সকল বিষয়ের যথার্থ প্রতিকার করিতে গেলে পোর্ট ব্লেয়ারকে কয়েদীর আবাসস্থল করিয়া রাখাই চলে না। কয়েদীদের ভাল করা যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে গার্হস্থ্যজীবন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; কিন্তু সাধারণ কয়েদীর স্ত্রীপুত্র পোর্ট ব্লেয়ারে গিয়া বাস করিতে ত স্বীকৃত হইবে না। সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কাহাকেও ভাল করাও ত চলে না।

আন্দামানে কয়েদীর উপনিবেশ রাখিলে স্বাস্থ্যবিষয়ে লক্ষ্য রাখা অর্থাভাবে সেখানে অসম্ভব হইয়া উঠিবে। সেখানকার ভূতপূর্ব্ব ও বর্ত্তমান সিনিয়র মেডিকাল অফিসর ডাক্তার ফার্ণসাইড ও ডাঃ মারে উভয়েই পোর্ট ব্লেয়ার হইতে কয়েদীর বাসস্থান উঠাইয়া দিবার স্বপক্ষে মত দিয়াছেন। বাস্তবিকই পোর্ট ব্লেয়ার থাকায় দুই চারি জন অকর্ম্মণ্য কর্ম্মচারী প্রতিপালন ভিন্ন আর কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না।

রাজনৈতিক কয়েদী।

সাধারণ কয়েদী অপেক্ষা রাজনৈতিক কয়েদীর আরও অনেক জ্বালা। সরকার বাহাদুরের আদেশ, যে, যাহারা রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত, তাহাদিগের

প্রতি সাধারণ কয়েদীর ন্যায় ব্যবহার করা হইবে। কিন্তু ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে সাধারণ কয়েদীর যত কষ্ট তাহা ত তাহাদের আছেই ; অধিকন্তু সাধারণ কয়েদীর অনেক সুখ সুবিধা তাহারা ভোগ করিতে পায় না। লেখাপড়া জানিলে সাধারণ কয়েদী জেলের বাহিরে গিয়া মুন্সী বা কেরাণীর কাজ পাইতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক কয়েদীদের চিরদিন জেলের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে হয়। তাঁহারা প্রায় সকলেই শিক্ষিত ; কিন্তু দড়ি পাকাইয়া আর ছোবড়া পিটিয়াই তাঁহাদের অধিকাংশকে দিন কাটাইতে হয়।

সাধারণ কয়েদীকে যে কয়টী শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে বাস্তবিক তাঁহারা তাহার কোন শ্রেণীতে ভুক্তই নহেন। তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণী-ভুক্ত করিয়া তাঁহাদের প্রতি অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবহার করা উচিত। এরূপ জোর করিয়া তাঁহাদের লাঞ্ছিত বা নির্য্যাতিত করিয়া কোন পক্ষেরই লাভ নাই। যাহারা অশিক্ষিত, পুস্তক বা সংবাদ পত্রাদির অভাবে তাহাদের কোন কষ্ট হয় না ; কিন্তু রাজনৈতিক কয়েদীর পক্ষে সে কথা খাটে না। অথচ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে পুস্তকাদি পড়িতে দিবার কোনই ব্যবস্থা নাই। যে কয়খানি পুস্তক পোর্ট ব্লেয়ার জেলে সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা রাজনৈতিক কয়েদীদিগেরই সম্পত্তি ; গবর্ণমেণ্ট তাহাতে এক পয়সাও দান করেন নাই।

রাজনৈতিক কয়েদীদিগের পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তা কহা নিসিদ্ধ। সুতরাং এক সময়ে একাধিকজন অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাঁহাদিগকে হাঁস-পাতালে না রাখিয়া স্বতন্ত্র কুঠরীর মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখা হয়। সে ঘরে পিছন দিকে একটী অতি ক্ষুদ্র জানালা ভিন্ন বায়ু চলাচলের কোনও ব্যবস্থাই নাই। সুস্থ অবস্থাতেই সেখানে মানুষের প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে, সুতরাং অসুস্থ হইয়া সেখানে একা পড়িয়া থাকিবার সময় মনের যে কি অবস্থা হয় তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কাহারও বুঝিবার সামার্থ্য নাই।

একে ত আহারাদির বিষম কষ্ট। তাহার উপর যেরূপ শারীরিক পরিশ্রম তাঁহাদের করিতে হয়, তাহাতে তাঁহারা অভ্যস্ত নহেন। রোগে সুচিকিৎসা নাই; তাহার উপর কথায় কথায় দণ্ড। সব চেয়ে অধিক কষ্ট অশিক্ষিত ও ইতর শ্রেণীর লোকদিগের কর্তৃত্বাধীনে জীবন যাপন করা। উঠিতে বসিতে যেরূপ লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হয়, তাহাতে সহজ অবস্থাতেই মানুষের মাথা খারাপ হইয়া যায়; কয়েদীর ত দূরের কথা। কেহ বা আত্মহত্যা করে। যাহাদের প্রাণ পাষাণ দিয়া বাঁধা, তাহারাই শুধু প্রাণের যন্ত্রণা প্রাণে লুকাইয়া ভবিষ্যতের আশায় দিন গণিতে থাকে।

এ যন্ত্রণার সার্থকতা কি? ইহা অপরাধের দণ্ড না বিদ্বেষপ্রসূত নির্য্যাতন?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আত্মকথা।

এত বড় দুঃখ ও বাঁধনের বেদনা জীবনে বরিয়া লইয়া কাহার কি ভাবে আন্দামানে দিন কাটিল, তাহা শুনিতে অনেক বন্ধু ও আত্মজন ব্যাকুল আছেন। কিন্তু এত জনের মনের অন্তঃপুরের কথা এক জনের জানা ও বলা অসম্ভব। তাই নিজের কথাই বলিব, সেই প্রসঙ্গ ক্রমে ব্যথার সহ-ব্যথীর অন্দরের দু' একটা হাতছানি আসিলেও আসিতে পারে।

যখন গলায় উদ্বন্ধনের ফাঁস বাঁধিয়া ফাঁসি-ঘরে বসিয়া দিন গণিতেছি, তখন আমার ভাবে টলমলে অবস্থা। মরণের সঙ্গে তখন নিরালায় মুখোমুখী বসিয়া পরম সোহাগে তাহার ঘোমটা লইয়া টানাটানি করিতেছি। কারণ দুঃখ-সুন্দর তখন কাণে কাণে বলিয়া গিয়াছে, যে, "ঐ কালো ঘোমটার মাঝে আলোয় আলো করা মন মজান রূপ আছে।" তাই আমিও বসন টানিয়া সে মুখ দেখিব, আর সেও দেখাইবে না। তোমরা জিজ্ঞাসা করিতেছ, "মরণকে কি ভয় করিত না?" করিত বই কি, তাই ত প্রথম দিন ফাঁসির হুকুম শুনিয়া অত হাসির মাঝেও আমার চক্ষের পাতা ভিজাইয়া জল আসিয়াছিল। মনে হইয়াছিল, যাহা প্রাণান্তেও দিতে চাহি নাই, সেই দেহ মন প্রাণ সর্ব্বস্ব বুঝি ঠাকুর এবার ছিনাইয়া লইল। মানুষ একটা অবিমিশ্র ভাবের সম্ভোগ কখন পায় কিনা জানি না। আমার কপালে ত চিরদিনই হুটোপাটি করিয়া একসঙ্গে একশ'টা ভাবের মাতামাতি কীর্ত্তনই জুটিয়াছে। ভয়ে বুক করিতেছে দুরু দুরু, তবু চক্ষু ছাপাইয়া সর্ব্বস্ব দিবার সুখ-অশ্রু! মন লুটাইয়া পড়িয়া বলিতেছে, "ওগো এত স্পর্শ এত গন্ধ এত রঙের রঙ্গরাজ! এখন আমার দেউলের বাতি নিবাইও না। এখন

যে আমার মরিয়াও সুখ নাই, কারণ এই তো আমার স্বামী-সোহাগের বয়স। বুকফাটা তৃষ্ণা ত এখনও তোমার চরণ পাইয়া মরিবার সুখে জুড়ায় নাই।” কিন্তু ঠিক তখনই আবার জ্ঞান-বিবেক মনের অজিনাসনে উদাস চিরবিরক্ত যোগে বসিয়া গাহিতেছে, “যেমন, জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে মন মিশায় জলে।” যে আসরে ঘরভরা মরাকান্না, সেই আসরে গীতগন্ধাকুল দীপোৎসব! এমনটি কা’র হয় জানি না, আমার ত হইয়াছিল।

যেমন ভাব তেমনি লাভ—ফাঁসীর হুকুম রদ হইয়া যাবজ্জীবন জীয়ন্ত করবন্থ থাকিবার হুকুম এক দিন আসিয়া পড়িয়া আমার মরণের পথ চাওয়া নিঃশেষ করিয়া দিল। তখন আবার পট-পরিবর্ত্তন হইয়া আন্দামানী আসরে জীবনের অভিনব দুঃখ-বিচিত্র খেলা আরম্ভ হইল। সুখকে চাহিয়া সুখের ঘরে যে বাসিন্দা, তাহার মাথায় অতর্কিতে সর্ব্বনাশা দৈবদুর্ব্বিপাক আসিলে বুঝি বড় বাজে; সমস্ত অন্তরাত্মা সুখের অভাব জনিত দুঃখে হাহাকার করিয়া উঠে। আমাদের বিপদটা কিন্তু ছিল ডাকিয়া আনা বিপদ, খাল কাটিয়া গাঙ্গের কুমীর ঘরে তোলা গোছের কাণ্ড। যত বড়ই বেদনা হউক, তাহা যদি যাচিয়া বরণ করা বেদনা হয়, তাহা হইলে তাহার অর্দ্ধেক ব্যথা গায়ে বাজে না; দুঃখের কষাঘাতে কেবলি হাসি পায়। প্রেমের পথের কাঁটা যত ফুটে, যত কষ্ট দেয়, ততই সুখ; কষ্ট না পাইলে যেন সে সুখের মেলা জমজমেই হয় না। তবু দুঃখ দুঃখ ত, তাই কতকটা যন্ত্রণা হইত বই কি; আমরা ঢাল তলোয়ারহীন দেশোদ্ধারা নিধিরাম সর্দ্দার হইলেও রক্ত মাংসের মানুষ ত।

দুঃখ ছিল অনেক। তাহার মধ্যে প্রথম প্রথম সঙ্গীর অভাবই ছিল সবার অধিক দুঃখ। কড়া হুকুম ছিল এক ব্লকে কাছাকাছি থাকিবে বটে, কিন্তু কেহ কাহারও সহিত কথা বলিতে পারিবে না। এক সঙ্গে চলা ফেরা আহার বিহার, অথচ কথা বলিতে না পাইয়া অন্তরাত্মার সে কি ক্ষুব্ধ

হাহাকার! একটু আধটু নল্‌চে আড়াল দিয়া চোখ ঠারাঠারি ও চুরি-করা আলাপ, তাহাতে দুঃখ বাড়িত বই কমিত না। অবৈধ আলাপে একটু অমনস্ক দশায় কাহাকেও ধরিতে পারিলেই খোয়েদাদ চাচার হাঁক উঠিত,—"এই বাঙ্গালী, থোড়া সরম করো।" কাজে অকাজে সরম করিতে করিতেই সদা জড়সড় আমরা মনে মনে ভাবিতাম, "একথা ত ছিল না! না হয় দেশই উদ্ধার করিতে গিয়াছিলাম, তা' বলিয়া চাঁপদাড়ীওয়ালা কাবুলী ননদিনীর মুখ ঝাম্‌টা সহিবার কথা কি ছিল? আর যখন তখন এত লজ্জাই বা কোথায় পাওয়া যায়।" এ যেন হিন্দুর ঘরের পতিবৎসলা লজ্জাবিজড়িতা কাপড়ের বস্তাটি আর কি! এমন দুর্দ্দৈবও মানুষের কপালে ঘটে! সেই আমরা প্রথম অবরোধের দুঃখ ও বিভীষিকা বুঝিলাম।

খাইবার পরিবার দুঃখ প্রথম প্রথম দুঃসহ হয় নাই; যত দিন যাইতে লাগিল, যতই প্রত্যহ ডাল ভাত ও কচুপাতা খাইবার এক ঘেঁয়ে ভাবটা কাঁটার মত বিঁধিতে আরম্ভ করিল, এবং যতই দেশের জল হাওয়ার গুণ ঘুচিয়া আন্দামানী জল হাওয়ার গুণ ধরিয়া আসিল, ততই আহারে রুচি ও মনের স্বস্তি চলিয়া গেল। কাজেই আহার করিতে হইত নিতান্তই কর্ত্তব্য-বোধে ও ক্ষুধার তাড়নায়, এবং সেই হেতু আহারের পরিমাণ যেরূপ মিতাচারে দাঁড়াইল তাহা যোগীজনবাঞ্ছিত—এ দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ভারতে নিতান্তই আবশ্যকীয় শিক্ষা। ব্রাহ্মণের গরু শুনিয়াছি খায় কম, কিন্তু গোবর ও দুধ দুইই বেশি পরিমাণে দেয়; আমাদেরও হইল এই গো-ব্রাহ্মণের অবস্থা। কয়েদী খায় কম, খাটে চতুর্গুণ। নিত্য এক বেলার আহার্য্যের পরিমাণ এই প্রকার—চাউল ৬ আউন্স, রুটির আটা ৫ আউন্স, ডাল দু' আউন্স, লবণ এক ড্রাম, তেল ½ ড্রাম, তরকারি আট আউন্স। এখানে চিঁড়া মুড়কির একদর, গুরুভোজী আধমোনী-কৈলাস ও আমার মত কৃশ গঙ্গাফড়িং উভয়ের জন্য ঐ পরিমাণ আহারের ব্যবস্থা।

তবে সুখের বিষয় আহার বড় একটা এ দেশে করিতে হয় না। পোর্ট ব্লেয়ারের ভাত জল কিছু কাল পেটে পড়িলেই ক্ষুধামান্দ্যের চরম দেখা দেয়। তাহার উপর যে চর্ব্বচোষ্য পরমান্নের ব্যবস্থা, তাহাতে রুচি ও ক্ষুধা অচিরেই জবাব দিয়া বসে। দুই বৎসর একঘেয়ে কচু শাক ও অন্ন আহার করিয়া নূতন কিছু তুচ্ছ মিঠাই মণ্ডা যে কি অমৃতই বোধ হইত, তাহা কি বুঝাইব? এক দিন সৈয়দ জব্বার নামে এক পাঠান ওয়ার্ডার রাত্রে পাহারার সময় আমার জন্য কিছু মাংস রাঁধিয়া গোপনে আনিয়াছিল, তাহার সুস্বাদ কখন পাণ্ডবপ্রিয়া দ্রৌপদীর স্বহস্তপক্ক রন্ধনেও থাকে কিনা সন্দেহ। এক দিন চার্লি বলিয়া এক পুরাতন কয়েদী (jail bird) রুটির সহিত চিনি ও টাটকা নারিকেল তৈল মাখিয়া আমায় খাইতে দিয়াছিল; বর্দ্ধমানের মিহিদানায় সত্য সত্যই অমন সুস্বাদ কখনও পাই নাই। পোর্ট ব্লেয়ারে সেই দুঃখের দৈন্যের জীবনে বেশ হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, যাহারা সুখের শয্যায় লালিত হইয়া নিত্য বহু সুখাদ্য আহার করে, তাহারা বড় কৃপাপাত্র! জিহ্বার আস্বাদন সুখে তাহাদের মত বঞ্চিত এ দুনিয়ায় আর কেহ নাই। দুঃখী বহু কষ্টে জীবনে দু' পাঁচ দিন পায়স পরমান্ন খাইয়া যে বিপুল আনন্দ পায়, রাজার গৃহে তাহা নাই। Hunger is the best sauce—ক্ষুধাই অন্নে আস্বাদ দেয়, ইহার বড় সত্য রসনার সুখভোগ বিষয়ে আর আছে কি?

বোধ হয় সকল বিষয়েই এই সত্য সবার বড় সত্য। অন্তরের মিলনে সুখী একপত্নিক বোধ হয় এইরূপেই লম্পটের অধিক সুখী। চিন্ময়ী নারীকে যে সুখ-সংযমের মাঝে পরমবন্ধনে পায়, মৃন্ময়ীর সঙ্গকামুক দেহের নিত্য-ব্যাপারী বুঝি এই কারণে সে অমৃতরসে চিরদিন বঞ্চিত।

"যে জগত-রাধা সে ত মোরি মাঝে!
নারী আর মোর আসিবে কি কাজে?

ভোগেতে সাকারা
মোক্ষে নিরাকারা
মোরে, ত্রিপুর-সুন্দরী দিয়েছে অভয়।
দেহে নিরঞ্জনী করি দরশন
আরে যে প্রেমে করেগো হৃদয়ে ধারণ
নিজ অঙ্গে লয়ে
হরগৌরী হয়ে
মহামায়া তারে শিব পদ দেয়।"

আন্দামানী জীবনে আর এক বড় দুঃখ স্বাধীনতা-হীনতা। দুই বৎসর সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকারূপ ইটের পাঁজায় বাস করিবার পর রাজার রাজ্যাভিষেকের সময়ে যখন প্রথম সেটলমেণ্টে রেহাই পাইলাম, তখন সে কি সুখ! প্রকৃতিসুন্দরীর সেই গিরিকুন্তলা হরিৎ অঙ্গ খানি যে মুগ্ধপ্রণয়ে চক্ষু ভরিয়া প্রথম কয়দিন দেখিয়াছিলাম, সে ভাব প্রণয়িনীর অঙ্গেই কেবল আত্মহারা প্রণয়ী দেখে। ভিক্টর হিউগোর সেই কথা—"The contraction of the whole universe into a single being and the expansion of a single being unto God—that is love"—বিশাল ব্রহ্মাণ্ড যখন একটি মানুষের রূপে গুটাইয়া আসে, আর সেই রূপটি যখন বিরাট হইয়া ভগবান অবধি ঢাকিয়া রাখে, তখনকার সেই অবস্থার নামই প্রেম। তাহা হইলেই দেখ, এই ক্ষণিক মৃদু পার্থিব সুখই সংযমের মধ্যে পাইলে নিবিড় অক্ষুরন্ত হইয়া উঠে, মানুষকে আনন্দের আত্মহারা যোগে যুক্ত রাখে—

"যোগরতো বা ভোগরতো বা
সঙ্গরতো বা সঙ্গবিহীনঃ।
পরমে ব্রহ্মণি যোজিত চিত্ত
নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব॥"

যোগরতই থাক, ভোগরতই থাক, সঙ্গসুখের কামুকই হও বা নিঃসঙ্গ নিষ্কাম হও, যার চিত্ত ব্রহ্মমগ্ন তার আনন্দ—আনন্দ, কেবল নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ।

স্বাধীনতা-হীনতা যে এত বড় দুঃখ তাহা জেলকর্ত্তৃপক্ষ জানেন, তাই কয়েদীর স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহা এমন অল্প অল্প করিয়া দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া ফিরাইয়া দিবার ব্যবস্থা। প্রথমে দিবারাত্র কুঠরী বন্ধ। তাহার পর গরাদে ঘেরা লম্বা বারাণ্ডায় মুক্তি। তাহার পর উঠানে, কারখানার কাজে, আরও বিস্তৃত জীবন। এইরূপে জেল বন্ধের কাল অতীত হইলে বাহিরে সেটেলমেণ্টে মুক্তি; সেখানে চারিদিকে দেয়াল নাই, পেটি অফিসার ওয়ার্ডার ও সাহেব সুবার তেমন হৃদ্‌কম্পজনক ভিড় নাই। কিন্তু তখনও রাত্রে ও ছুটির দিন ব্যারাকে বন্দী হইবার এবং গুণতি দিবার বিড়ম্বনা আছে।

দুই বৎসর জেলে বেড়িবেষ্টিত জীবনের পর হঠাৎ বাহিরে প্রকৃতির কোলে সে আংশিক মুক্তিও বড় মধুময় বোধ হইয়াছিল। ছুটির সময় বনের শ্যাম নিথর শান্তিতে আপন খেয়ালে বেড়াইবার সুখ এই বঞ্চিত প্রাণ কয়টিতে অমৃতের কাজ করিত। কিন্তু পরক্ষণেই নিত্য কর্ত্তব্যের কঠোরতায় ও রৌদ্রের কষ্টে এমন আনন্দও বিষাক্ত হইয়া উঠিত।

বাহিরে পাঁচ বৎসর কাজ করিবার পর মাহিনা পাইলে পেটি অফিসার বা টিণ্ডাল হইবার সেই বড় মুক্তি আমাদের অদৃষ্টে ত ঘটেই নাই; দশ বৎসরের বন্দী দশা ও বাধ্যতামূলক কাজ কর্ম্মের পর ১৲ টাকা মাহিনায় প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া যে স্বোপার্জ্জনের জীবন তাহাও কখন ভাগ্যে ঘটে নাই। এই অবস্থায় ইচ্ছা করিলে টিকিটপ্রাপ্ত স্বাধীন Self-supporter কয়েদী মেয়ে-জেল হইতে আপন মনোমত পাত্রী সন্ধান করিয়া বিবাহ করিতে পারে; চিফ কমিশনারের আদেশ পাইলে স্বাধীন (free) রমণীর পাণিগ্রহণও অসম্ভব বা অবৈধ নয়। দেশ হইতে স্ত্রী পুত্র আত্মীয় পরিজনও আসিয়া পোর্ট ব্লেয়ারের

সীমানার মধ্যে মুক্ত কয়েদীর ঘর করিতে পারে। এবারে রাজাজ্ঞায় বিড়ালের ভাগ্যে হঠাৎ শিকা ছিঁড়িয়া দেশে না আসিতে পাইলে বোধ হয় সোপার্জ্জনের অধিকার পাইতাম। সেই বন্দোবস্তই হইতেছিল।

এই দুঃখের বন্ধনে ও হতাশার পীড়ন ও ব্যর্থতার মাঝে আমাদের নিত্য সহচর ছিল পুস্তক। আজ কাল তৃতীয় শ্রেণীর মজুর কয়েদী বৎসরে নাকি তিনবার দেশে পত্রাদি দিতে ও দেশ হইতে পত্রাদি পাইতে পারে। কিন্তু তখন বৎসরে মাত্র একবার আমরা লিখিতাম ও একবারই আত্মজনের কুশল সংবাদ পাইতাম। মজুর কয়েদী দেশ হইতে জুতা জামা কাপড় বই শ্লেট তৈজসপত্র প্রভৃতি অল্প দামের জিনিস মাত্র আনাইতে পারে; তাও আবার জেলে আমরা কেবল বই পাইতাম, তদতিরিক্ত আর কিছু আসিলে গুদামে জমা থাকিত। আমাদের মধ্যে যাহার ঘরে কিছু সঙ্গতি সম্পদ ছিল, সে প্রতি বৎসর ২০।২৫ খানা করিয়া বই আনাইত। এই বইগুলি সেণ্ট্রাল টাওয়ার বা গুমটিতে জমা থাকিত, প্রতি রবিবারে সকালে একখানি করিয়া বই প্রতি জনে সপ্তাহের মত পাইতাম। কিন্তু শেষাশেষি হেমচন্দ্রকে ফাঁকি দিয়া কোন ওয়ার্ডার পাঠাইয়া বা স্বয়ং রবিবারে বই পরিবর্ত্তনের সময়ে বগলদাবায় চুরি করিয়া একটার অধিক বই রাখা আমাদের নিত্যকার্য্য ছিল। দেশ হইতে কাহারও নূতন পার্শ্বেল আসিলে একটা মহোৎসব পড়িয়া যাইত। বই চুরি করিবার কত ফন্দিই যে আঁটিতাম, দৈবকৃপায় কৃতকার্য্য হইলে কি আনন্দই যে পাইতাম!

নিতান্ত প্রাণের দায়ে আরও অনেক প্রকার চুরি অভ্যাস করিতে হইয়াছিল। ভাণ্ডারা বা পাকশালা হইতে লবণ লঙ্কা ও তেঁতুল এবং ৭ নম্বর হইতে নারকেল চুরি করিয়া চাটনি পেশাইতে পারিলে সে দিন অমন আধ কাঁচা রুটি ও পিণ্ড ভাত কি সুমিষ্টই না লাগিত! নারিকেলের জল, কচি দই নারকেল চুরি করিয়া খাওয়া স্বধর্ম্মে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। মাহিনা পাই